ইউনিট ৭ দীর্ঘমেয়াদী ফলগাছের চাষ

যেসব ফলগাছ দীর্ঘজীবী এবং একবার ফল দেয়া শুরু করে বহু বছর ফল দিয়ে থাকে সেগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী ফলগাছ বলা হয়। যেমন- আম, লিচু, কাঁঠাল ইত্যাদি। এসব ফলগাছের ফল ছাড়াও এগুলোর কাঠ আসবাবপত্র তৈরির জন্য যথেষ্ট মূল্যবান। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এগুলোর অবদানও যথেষ্ট। তাই দীর্ঘমেয়াদী ফলগাছগুলোর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আম, লিচু, কাঠাল, পেয়ারা, লেবুজাতীয় ফল, নারিকেল ইত্যাদি দীর্ঘ মেয়াদী ফল গাছের চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৭.১ আম

এ পাঠ শেষে আপনি –

- আমের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমের জলবায়ু ও মাটির বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আমের চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

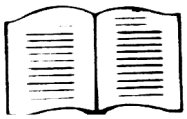

উৎপত্তিস্থল

আম ৪ হাজার বছরের বেশি সময় ধরে ভারত উপমহাদেশে চাষ হয়ে আসছে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী

উলে-খ করেছেন যে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে মালয়েশিয়া দ্বীপপুঞ্জ আমের উৎপত্তিস্থল (Centre of origin)। কিন্তু বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর মতে আসাম-মিয়ানমার-থাইল্যান্ড ও ইন্দোচায়না অঞ্চলেই আমের আদি উৎপত্তিস্থল। তবে খাওয়ার উপযোগী (Edible) আমের উৎপত্তিস্থল আসাম-মিয়ানমার অঞ্চলেই। লক্ষ্য করার বিষয় বাংলাদেশ এ অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত।

উৎপাদন

বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমের চাষ হচ্ছে। আম উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বে অন্যতম দেশগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, চীনদেশ, ব্রাজিল, মেক্সিকো, হাইতি, কিউবা, ইজিপ্ট ও সুদান। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪৯,০০০ হেক্টর জমিতে আম গাছ রয়েছে এবং বছরে ১৮০,০০০ টন আম উৎপাদন হয়ে থাকে।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

পুষ্টিমান

পাকা আম খাদ্যপ্রাণ এ তে অত্যন্ সমৃদ্ধ। কাঁচা আমে পাকা আমের দ্বিগুণ খাদ্যপ্রাণ সি রয়েছে। বিভিন্ন জাতের আমের ভক্ষণযোগ্য অংশ এবং পুষ্টিমান বিভিন্ন হয়ে থাকে। পাকা আমের প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ১২১.৯ থেকে ৪২২.৬ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ এ এবং ১৩.২ থেকে ৮০.৩ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ সি রয়েছে (Singh, ১৯৫৯)। তাছাড়া খাদ্যপ্রাণ বি, বি-১ ও বি-২ রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস ও লৌহ আছে।

ব্যবহার

আমকে প্রাচ্যের ফলের রাজা বলা হয়।

কবি আমীর খসরু চর্তুদশ শতাব্দীতে আমকে হিন্দুস্থানের সেরা ফলরূপে উল্লেখ করেন। বিখ্যাত উদ্যানতত্ত্ববিদ পোপেনো আমকে 'প্রাচ্যের ফলের রাজা' বলেছেন। এদেশের সব শ্রেণির, সব পেশার অতি প্রিয় ফল আম। আম কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই সরাসরি খাওয়া যায় বা প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে খাওয়া যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্ তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

জংলী আম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেখা যায়।

আম Anacardiaceae পবিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Mangifera indica* এবং বাংলাদেশের আমের সব জাত এর অন্ ভুর্ক্ত। তবে *Mangifera sylvatica* প্রজাতির এক জংলী আম বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেখা যায়।

সাধারণতঃ আমগাছ মাঝারি থেকে বৃহদাকার বৃক্ষ। বামন জাতের আমগাছ অবশ্য এর ব্যতিক্রম। আমগাছ ৭.৫ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে এবং ৬ থেকে ১৮ মিটার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। আমগাছের প্রধান কান্ডটি সরল এবং প্রকান্ড এর ওপরই শাখা-প্রশাখা জন্মে। আম চিরহরিৎ বৃক্ষ। পাতা বর্শাকৃতি ও মসৃণ। বছরে ৩-৪ বার নতুন পাতা গজায়। আমগাছের প্রধান ম ল ৪.৫ থেকে ৬.০ মি. মাটির গভীরে যেতে পারে।

মাঘ-ফাল্গুন () মাসেই আমের মুকুল বের হয়। অবশ্য দেশের প র্বাঞ্চলে এর প্রায় একমাস আগেই মুকুল আসে। গুটি আমের গাছেও আগে মুকুল আসে। পম্পমঞ্জরী বহু শাখা-প্রশাখায় ডোম বা পিরামিড আকৃতির হতে পারে। এগুলো দৈর্ঘে ১০-৬০ সে. মি. হয়। এক একটি পুষ্পমঞ্জরীতে ১০০০ পর্যন্ত ফুল থাকতে পারে। একই পুষ্পমঞ্জরীতে স্ত্রী ফুল, পুরুষ ফুল ও উভয়লিংগ ফুল থাকে। সাধারণত শতকরা ৯০ ভাগই থাকে পুরুষ ফুল। স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ফুল বের হওয়ার পর থেকে ফোটা পর্যন্ত চার সপ্তাহ সময় লাগে এবং ফুল ফোটা থেকে ফল ধারণে দু'সপ্তাহ সময় লাগে। আম উদ্ভিদতত্ত্বে ড্রুপ (Drupe) নামে পরিচিত। আম বিভিন্ন আকৃতির ও সাইজের হয়ে থাকে।

একই পুষ্পগঞ্জরীতে স্ত্রী ফুল, পুরুষফুল ও উভয়লিঙ্গ ফুল থাকে।

চিত্র ৭.১.১ঃ গোপালভোগ, হিমসাগর ও খিরসাপাত জাতের আম

জাতসমূহ

বাংলাদেশের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ গাছ গুটি আমগাছ।

যেহেতু আম পরপরাগায়িত ফল সুতরাং যৌন পদ্ধতিতে অর্থাৎ আঁটি বা বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি হওয়ায় আমের অসংখ্য জাতের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে সাধারণভাবে গুটি আম বলা হয়। গুটি আমগাছগুলো প্রত্যেকটি ভিন্ন জাত। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রায় ২৫০ টি সুনির্দিষ্ট জাত রয়েছে। নিম্নে বহুল প্রচলিত কয়েকটি জাতের বিবরণ দেয়া হলো।

গোপালভোগ ঃ বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট জাতসমূহের মধ্যে এ আমটি সবচেয়ে আগাম। এটি একটি মাঝারি আকৃতির আম। ফল কিঞ্চিত লম্বা কিন্তু অনেকটা গোলাকার। ফলের বুক মাঝারী, কাঁধ উঁচু ও নিচের অংশ প্রায় গোলাকার। পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা সবুজ থেকে কিঞ্চিত হলুদাভ থেকে গাঢ় হলুদ। এ ফল সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, রসাল, আঁশবিহীন ও বেশ মিষ্টি। খোসা সামান্য মোটা ও আঁটি পাতলা। এটা একটি আশু জাত। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময় ফল পাকতে আরম্ভ করে এবং আষাঢ় মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে পাকা শেষ হয়। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৫-৮ দিন সময় লাগে। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় চার মাস সময় লাগে। ফলের বোঁটা বেশ শক্ত। তাই ঝড়ো হাওয়ায় তেমন ঝরে পড়ে না।

খিরসাপাত ঃ খিরসাপাত উৎকৃষ্ট জাতসম হের মধ্যে একটি আগাম জাত। ফল মাঝারি আকারের এবং অনেকটা ডিম্বাকৃতির। পাকা ফলের ত্বকের রং সামান্য হলদে এবং শাঁসের রং হলুদাভ। শাঁস আঁশবিহীন, রসাল, গন্ধ আকর্ষণীয় ও বেশ মিষ্টি। ফলের খোসা সামান্য মোটা ও শক্ত এবং আঁটি পাতলা। জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আম পাকা শুর€ করে। ফল পাকার পর পাকতে প্রায় ৫-৭ দিন সময় লাগে। ফলন খুবই ভালো তবে অনিয়মিত। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় চার মাস সময় লাগে।

মহানন্দা ঃ এ জাতটি অতি সম্প্রতি ১৯৯৫ সালে উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মুক্তায়িত হয়েছে। ফল কিছুটা ডিম্বাকার, গোলাকৃতি এবং ছোট আকৃতির। পাকা ফলের ত্বকের রং হলুদ। শাঁস গাঢ় হলুদ, সুগন্ধযুক্ত, মধ্যম রসাল, আঁশবিহীন ও বেশ মিষ্টি। খোসা পাতলা ও মসৃণ। আঁটি ছোট ও পাতলা, জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আম পাকা শুর€ হয়। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে চার মাস সময় লাগে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৫-৬ দিন সময় লাগে। গাছে প্রচুর ফল ধরে এবং নিয়মিত ফলন দেয়। এ আমের বোঁটা শক্ত হওয়ায় সামান্য ঝড়ো হাওয়া তেমন ক্ষতি করতে পারে না। আমের সংরক্ষণশীলতাও উত্তম।

উৎকৃষ্ট জাতের আমের মধ্যে ল্যাংড়া সর্বাধিক জনপ্রিয়।

ল্যাংড়া ঃ উৎকৃষ্ট জাতের আমের মধ্যে ল্যাংড়া সর্বাধিক জনপ্রিয়। এই ডিম্বাকার গোলাকৃতি আমের পাকা অবস্থায় ত্বকের রং হালকা সবুজ থেকে হালকা হলুদাভ হয়ে থাকে। শাঁস হলুদাভ, সুগন্ধী, সুস্বাদু, সুমিষ্ট ও আঁশবিহীন। খোসা পাতলা ও আঁটি ছোট। এটি একটি মধ্য মৌসুমী জাত। এ জাতের আম জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে পাকতে শুরু করে ও আষাঢ় মাসের শেষ পর্যন্ বাজারে পাওয়া যায়। ফলন ভালো তবে অনিয়মিত। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে চার মাস সময় লাগে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৪ থেকে ৬ দিন সময় লাগে।

হিমসাগর ঃ এটি একটি উৎকৃষ্ট জাতের আম। এ জাতের আম ডিম্বাকার ও মাঝারি আকৃতির। ফলের ত্বকের রং সবুজাভ হলুদ ও মসৃণ। শাঁস গাঢ় হলুদ, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, রসাল, আঁশহীন ও মিষ্টি। খোসা মাঝারি ধরনের পুরু ও আঁটি মাঝারি এ ফল আষাঢ় মাসে পাকে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৫-৭ দিন সময় লাগে। গাছে প্রচুর ফল ধরে। ফলের বোঁটা বেশ শক্ত বলে ঝড়ো হাওয়া সহ্য করতে পারে।

সূর্যপুরী ঃ এটি প্রধানত বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার একটি উৎকৃষ্ট জাতের আম। এ জাতের আমের আকার ছোট এবং অনেকটা ডিম্বাকৃতি। পাকা ফলের ত্বকের রং হলুদ। শাঁসের বর্ণ গাঢ় হলুদ। আঁশ মধ্যম রসাল ও মিষ্টি। খোসা পাতলা ও মসৃণ। আঁটি ছোট ও পাতলা। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে আম পাকতে শুর€ করে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৩-৪ দিন সময় লাগে। পাকা আমের সংরক্ষণশীলতা ভালো। গাছে প্রচুর ফল ধরে। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে চার মাস সময় লাগে।

ফজলী ঃ ফজলী বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ও সমাদৃত আম। বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ জেলায় উৎকৃষ্ট ফজলী আম উৎপন্ন হয়। এ ফল বৃহদাকৃতির। আমটি দীর্ঘ ও কিছুটা চ্যাপ্টা ধরনের। পাকা আমের ত্বকের বর্ণ প্রায় সবুজ থেকে হালকা হলুদাভ। শাঁস হলুদ, আঁশবিহীন, রসাল, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু ও মিষ্টি। খোসা পাতলা, আঁটি/বীজ লম্বা, চ্যাপ্টা ও পাতলা। এটি একটি নাবী জাত। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফল পাকে। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৭-৮ দিন সময় লাগে। এ জাতের ফলন মাঝারি তবে ফল ধারণ মোটামুটি নিয়মিত। ফজলী আমের গাছ বৃহদাকারের হয় এবং পাতাও বড় আকারের হয়ে থাকে।

আশ্বিনা ঃ যদিও অন্যান্য উৎকৃষ্ট জাতসম হের তুলনায় নিম্মানের তথাপি নাবী জাত হিসেবে আশ্বিনা আম বাণিজ্যিক দিক থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আকার-আকৃতি ও বর্ণে এর ফল ফজলীর কাছাকাছি তবে গুণে ফজলী অপেক্ষা অনেক নিম্মানের। ফল কিছুটা তির্যকভাবে ডিম্বাকৃতি ও কিছুটা চ্যাপ্টা। আকার মাঝারি থেকে বড়। ফলের ত্বক সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ। শাঁস হলুদ থেকে হলুদাভ কমলা বর্ণের এবং কখনও কখনও কমলাভ লাল, মোলায়েম, রসাল, প্রায় আঁশবিহীন ও মিষ্টি। খোসা মোটা ও আঁটি ছোট। শ্রাবণ মাসে আম পাকতে শুরু করে। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৭-৯ দিন সময় লাগে। ফলের সংরক্ষণশীলতা উত্তম। গাছ মধ্যম থেকে দীর্ঘ ও ছড়ানো প্রকৃতির।

বংশ বিস্তার

আম যেহেতু পরপরাগায়িত এর কোনো নির্দিষ্ট জাতের মাতৃগুণাগুণ বংশ পরম্পরায় ধরে রাখতে হলে অঙ্গজ বা অযৌন পদ্ধতিতে অর্থাৎ কলমের সাহায্যে এর বংশ বাড়াতে হবে।

আঁটি থেকে চারার গাছ মাতৃগুণাগুণ ধরে রাখতে পারে না। তাই কলমের সাহায্যে আমের বংশ বৃদ্ধি করার গুর€ত্ব অপরিসীম।

অঙ্গজ বংশ বৃদ্ধির উপকারিতা ঃ কলমের গাছে মাতৃগুণাগুণ বজায় থাকে; গুটির গাছের চেয়ে অনেক আগেই ফুল ও ফল দেয়া শুরু করে; কলমের মাধ্যমে আদিজোড়/বহু আদিজোড়ের সুবিধা যেমন- গাছের সাইজ ছোট করা, ক্ষতিকর পোকা ও রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতিকূল পরিবেশ সহ্যক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। তাই অঙ্গজ পদ্ধতিতে বা কলমের সাহায্যে আমের বংশ বৃদ্ধি করার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে আমের কলম করতে হলেও আম আঁটি থেকে গজানো চারার প্রয়োজন হয় যা বীজতলায় বা পলিব্যাগে বা টবে উৎপাদন করা হয়।

বীজতলা তৈরি ঃ আমের আঁটি থেকে চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলার প্রয়োজন হয়। বীজতলা দু'ধরণের হয়ে থাকে। প্রথম বীজতলা আঁটি অংকুরোদগমের জন্য ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় বীজতলা অংকুরিত চারা দুই বা চার সারিতে নির্দিষ্ট দ রত্বে (৫০ থ ২৫ সে. মি.) রোপণ করা হয়। বীজতলার

জন্য উঁচু পর্যাপ্ত আলোবাতাস পায়, বর্ষার পানি দাঁড়ায় না এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত। বীজতলার মাটি চাষ দিয়ে ঝুরঝুরে ও আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। এরপর এক মিটার চওড়া, ১৫ সে. মি. উঁচু এবং প্রয়োজন মত বা পাঁচ মিটার লম্বা বীজতলা তৈরি করতে হয়। বীজতলার মাটিতে পর্যাপ্ত পঁচা গোবর সার বা আবর্জনা পঁচা সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশাতে হয়। প্রথম বীজতলায় মাটি ও পচা গোবর সারের অনুপাত ১ঃ১ হলে ভালো হয়। তবে দ্বিতীয় বীজতলায় এ অনুপাত ২ঃ১ হলেও চলবে। দুইটি বীজতলার মধ্যে ৫০ সে. মি. জায়গা পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা হিসেবে কাজ করে। এছাড়া পলি ব্যাগে (৩০ থ ২০ সে. মি.) আমের চারা উৎপাদন করা যেতে পারে।

চারা উৎপাদন ঃ আমের আঁটি ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে অংকুরোদগম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই রোগমুক্ত ও পাকা আম থেকে আঁটি সংগ্রহ করে সাত দিনের মধ্যে প্রথম বীজতলায় ঘন করে বিছিয়ে পাঁচ সে. মি. মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বীজতলায় যেন প্রয়োজনীয় রস থাকে এবং কখনও পানি না দাঁড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং যত্নবান হতে হবে। যে সব আঁটি পানিতে ডুবে যায় শুধুমাত্র সেসব আঁটি চারা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা উচিত। অংকুরোদগমের পরপরই চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করতে হবে। চারা বেডে/পলিব্যাগে রোপণের পর ঘন ঘন পানি সেচ দিতে হবে এবং আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। যে সব চারার গঠন বিকৃত হয়ে থাকে বা পাতা সবুজ রংয়ের পরিবর্তে সাদা রংয়ের হয় সেগুলো সরিয়ে পুড়ে ফলতে হবে। প্রথম তামাটে রংয়ের পাতা বের হবার পর থেকে এক বছর বয়সের চারা কলম করার জন্য খুব উপযোগী।

অঙ্গজ পদ্ধতিসম হের বিবরণ ঃ আমগাছের অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। আমগাছের অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি বেশ ক'টি পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। যে সব পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত এবং সুপারিশ করা হয় সেগুলোর চিত্র ও বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো।

ভিনিয়ার কলম (Veneer method) ঃ আমের অঙ্গজ বংশ বিস্তারের জন্য ভিনিয়ার কলম একটি সহজ ও সফল পদ্ধতি। এক্ষেত্রে এক থেকে দু'বছর বয়সের চারা আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে সাধারণতঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ভিনিয়ার কলম করা হয়ে থাকে।

সফল কলমের গাছ যদি বীজতলায় জন্মানো হয়ে থাকে এবং কলম করার আগে টবে বা পলিব্যাগে উঠানো না হয়ে তবে পরবর্তী বছর মৌসুমী বৃষ্টি শুর€ হলে এগুলো প্রথমে 'খাসি' করে নিতে হবে।

ফাটল কলম (Cleft method) ঃ আমের অঙ্গজ বংশবৃদ্ধির মধ্যে এটি অত্যন্ত সহজ ও সরল পদ্ধতি। ফিলিপাইনে আমের কলম তৈরিতে ফাটল কলম পদ্ধতি ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। প্রথমে আমের চারা যেগুলো আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার হবে সেগুলো ৮ থেকে ১২ মাস বয়সের এবং সতেজ ও সবল হওয়া চাই।

ষ্টোন গ্রাফটিং (Stone grafting) ঃ অল্প সময়ে অধিক কলম উৎপাদনে ষ্টোন গ্রাফটিং একটি সফল পদ্ধতি। এটি ফাটল কলমের মত। এক্ষেত্রে চারার বয়স ১০-১২ মাস না হয়ে ১০-১৫ দিন হয়ে থাকে।

'টপ ওয়ার্কিং পদ্ধতির মাধ্যমে আঁটি গাছকে কাংখিত কলমের গাছে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

টপ ওয়ার্কিং বা বয়স্ক আঁটির গাছ কলমের গাছে রূপান্তরকরণ ঃ ১০-১৫ বছরের বা আরও অধিক বয়সের আঁটির গাছের আম যদি গুণে-মানে ভালো না হয় তবে এক্ষেত্রে 'টপ ওয়ার্কিং' পদ্ধতির মাধ্যমে আঁটির গাছটি কাংখিত কলমের গাছে রূপান্তরিত করা সম্ভব। প্রথমে যে কোনো একটি প্রধান শাখা-প্রশাখা ছেঁটে ফেলতে হয়। কাটা জায়গায় আবার নতুন শাখা বের হবে। এগুলোর বয়স যখন ৩-৪ মাস এবং বৃদ্ধি বেশ সতেজ ও সবল তখন সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নির্বাচিত গাছ থেকে সায়ন সংগ্রহ করে আঁটির গাছের নতুন শাখায় ১০-১৫ টি ভিনিয়ার কলম করা হয়। ভিনিয়ার কলম সফল

হওয়ার আগে এবং পরে কলমের ডালে যদি মূল গাছের শাখা প্রশাখা বের হয় সেগুলো খেয়াল করে ভেঙ্গে দিতে হবে। এভাবে এক এক বছর এক একটি প্রধান শাখা রূপান্তরিত করে গাছটিকে কাংখিত কলমের গাছে পরিণত করা যাবে।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু

বাংলাদেশের জলবায় ও মাটি আম উৎপাদনের খুবই উপ-যোগী।

আম প্রধানতঃ উষ্ণমন্ডলের ফল। তবে এর বিস্তৃতি অব উষ্ণমন্ডল পর্যন্ত । সর্বপ্রধান আম উৎপাদনকারী দেশ ইন্ডিয়ার প্রধান আম উৎপাদন অঞ্চলগুলো ৮ থেকে ৩০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ বিস্তুত। পাকিস্তানের আম উৎপাদন এলাকাগুলো ২৪ থেকে ৩২ ডিগ্রী এবং মেক্সিকোর অবস্থান ১৫ থেকে ৩১ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে। বাংলাদেশের অবস্থান ২০ থেকে ২৭ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে।

সুতরাং সমগ্র বাংলাদেশ অক্ষাংশের দিক থেকে আম উৎপাদনের এলাকার মধ্যে অবস্থিত। অধিকন্ত

আম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত স্থানে জন্মে। বাংলাদেশ কোনো স্থানেই এর উর্দ্ধে নয়। বাংলাদেশের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা ১৮-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আম উৎপাদনের জন্য ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রী সেঃ সবচেয়ে উপযোগী সুতরাং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের তাপমাত্রা আম উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী।

বৃষ্টিপাত ঃ আম উৎপাদনের জন্য বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণ খুবই গুর€ত্বপ র্ণ। সেচ সুবিধা থাকলে বছরে ২৫০ মি. মি. বৃষ্টিপাত আম উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট। আম ২৫০০ মি. মি. বা তার অধিক

বৃষ্টিপাত হলেও উৎপাদন হতে পারে। যদি ফুল আসা থেকে ফল ধারণ পর্যন্ বৃষ্টিপাত না হয় তবে আমের ফলন ব্যহত হয়না। আমের ফুল আসা এবং ফল ধারণ জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যেই শেষ হয়। সে সময় দেশের কোথাও তেমন বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে।

মাটি

আমগাছ যে কোনো মাটিতেই জন্মিতে পারে। মাটি পাললিক, বেলে, দোঁআশ বা এঁটেল হোক তাতে

আম গাছের বৃদ্ধিতে তেমন কিছু অসুবিধা হয় না। তবে মাটি ২.০ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ গভীর হওয়া চাই। আমের জন্য মাটি পি,এইচ ৫.৫ থেকে ৭.০ সবচেয়ে ভালো। পৃথিবীর আম উৎপাদনকারী

দেশসম হের মাটির পি,এইচ ৪.৫ থেকে ৭.০ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মাটির

পিএইচ ৫.০ থেকে ৮.০ এবং প র্বাঞ্চলে ৪.৫ থেকে ৬.০।

সুতরাং বাংলাদেশের জলবায়ু এবং মাটি আম উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী।

চাষাবাদ প্রণালি ঃ উঁচু এবং পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত জমি আম বাগানের জন্য উত্তম। একটি আমগাছ ৭০-৮০ বছর ধরে ফল দেবে। সুতরাং রোপণের সময় আমগাছ রোপণের স্থান নির্বাচন এবং

কোনো জাতের গাছ রোপণ করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রোপণের দ রত্ব ঃ আমাদের দেশে যে সব উন্নতজাত আছে সেগুলো সবই ৮-১০ মি. উঁচু হয়ে থাকে

এবং প র্ণ বয়স্ক অবস্থায় ৫-৬ মি. উভয় পাশে প্রসারিত হয়। কাজেই রোপণের দ রত্ব ১২.৫ থ ১২.৫ মি. হয়ে থাকে। ইন্ডিয়ার আম্রপালি জাত একটি বামন জাত। এজাতটি ৩ থ ৩ মি. দূরত্বে রোপণ করা

যায়। ১২.৫ থ ১২.৫ মি. দূরত্বে গাছ রোপণ করলে প্রতি হেক্টরে মাত্র ৬৪ টি গাছ রোপণ করা যায়। অথচ ৩ থ ৩ মি. গাছ রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ১১০০ টি গাছ রোপণ করা যায়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ ঃ জমি কয়েকবার চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। এরপর জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে ১০ থেকে ২৫ টন আবর্জনা পঁচা সার বা গোবর সার জমিতে সমান ভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে। এর পর ৫০ সে. মি. গভীর করে ১ থ ১ মি. সাইজের গর্ত তৈরি করতে হবে। মাটির পিএইচ ৬.০ এর নিচে হলে গর্ত প্রতি এক কেজি করে চুন হিসাব করে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে গর্তে সেচ দিতে হবে। এর ১০ থেকে ১৫ দিন পর ১০ কেজি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট প্রতিটি গর্তের উপরের ২৫ সে. মি. মাটির সাথে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

চারা রোপণ ও সময় ঃ বৈশাখ (April-May) মাসেই চারা রোপণের উপযুক্ত সময়, তবে চৈত্র-বৈশাখ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ অথবা ভাদ্র-আশ্বিন (August-October) মাসেও গাছ রোপণ করা যাবে। তবে অতিরিক্ত বর্ষার মধ্যে চারা রোপণ না করাই ভালো। চারা রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনো ক্রমেই গাছের গোড়ার শিকড়সহ মাটির বলটি ভেঙ্গে না যায় এবং রোপণের সময় গাছটির গোড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাটির নিচে ঢুকে না যায়। জীবজন্তু বা বাতাসে গাছের গোড়া যাতে না নড়ে সেজন্য দু'টি খুঁটি পুঁতে বাংলার চার এর মত করে ভালোভাবে রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। রোপণের পরপরই গাছে পানি দিতে হবে। বৃষ্টি না হলে রোপণের পর ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন বা একদিন অন্তর অন্তর গাছে পানি দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ চারা রোপণের পর থেকেই গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পরিচর্যা অত্যাবশ্যক। আম বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এজন্য মাঝে মাঝেই চাষ দেয়া ভালো। রোপণের পর বৃষ্টি না থাকলে প্রথম ১৮ মাসে শুষ্ক মৌসুমে এক সপ্তাহ পরপর সেচ দিতে হয়। এরপর পাঁচ বছর পর্যন্ত দু'সপ্তাহ পরপর সেচ দেয়া বাঞ্চনীয়। গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য যথাযথ সার প্রয়োগ দরকার।

সার প্রয়োগ ঃ বিভিন্ন বয়সের আমগাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ সারণি-১ এ দেখান হলো।

সারণি ১ ঃ বিভিন্ন বয়সের আমগাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ

গাছপ্রতি সারের পরিমাণ	গাছের বয়স (বছর)					
	০২-০৪	০৫-০৭	০৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০ এর ঊর্ধ্বে
গোবর বা আর্বজনা পঁচা সার (কেজি)	১০-১৫	১৬-২০	২১-২৫	২৬-৩০	৩২-৪০	৪১-৫০
রাসায়নিক সার (গ্রাম)						
ইউরিয়া	২৫০	৫০০	৭৫০	১০০০	১৫০০	২০০০
টিএসপি	২৫০	২৫০	৫০০	৫০০	৭৫০	১০০০
এমপি	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪৫০	৫০০
জিপসাম	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিঙ্কসালফেট	১০	১০	১৫	১৫	২০	২৫

গাছ রোপণের বছর ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে একভাগ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ বর্ষা আরম্ভের শুরুতে এবং আর একভাগ আশ্বিনে অর্থাৎ বর্ষার শেষে গাছের চার দিকে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছগুলো বৃদ্ধির সাথে সাথে জৈব ও রাসায়নিক সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে যা ছক-১ এ দেখান হলো। উল্লিখিত সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তি আশ্বিন মাসের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে যথেষ্ট রস

না থাকলে সার দেয়ার পর সেচ দিতে হবে। ছোট গাছের গোড়া থেকে ৪০-৫০ সে. মি. দ রে, মাঝারি বয়সী গাছের ২-৩ মি. দূরে এবং বড় গাছের বেলায় দুই গাছের মধ্যবর্তী স্থানে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছ বড় হয়ে গেলে মধ্যবর্তী স্থানে সার প্রয়োগ করে টিলার দিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে সার মিশিয়ে দেয়াই উত্তম।

ছাঁটাইকরণ ঃ রোপণের ২-৩ বছর পর্ন্ত গাছের গোড়া থেকে ডালপালা গজালে তা কেটে ফেলতে হবে। গাছের প্রধান কান্ডটি যাতে সোজাভাবে এক মিটার উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই উচ্চতায় গাছের চারপাশে প্রসারিত ৪ থেকে ৬ টি শাখা বাড়তে দেয়া যেতে পারে। এতে গাছের সব অংশ সমান ভাবে পাবে এবং পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হবে। ভিতরমুখী ডালগুলো

কেটে ফেলা উচিত এবং বহিমুখী ডালগুলো রাখা উচিত। রোগাক্রান্ত , দুর্বল, মরা ও শুকনো ডালপালা কখনও গাছে রাখতে নাই।

ফুল ভাংগন ঃ কলমের গাছে রোপণের বছর থেকেই ফুল আসতে পারে। এ ফুলগুলো ভেঙ্গে না দিলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং গাছের শক্ত মজবুত কাঠামো তৈরি ব্যহত হয়। সেজন্য গাছের বয়স ৩-৪

বছর প র্ণ হওয়ার আগে ফুল আসলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছের ৩-৪ বছর প র্ণ হওয়ার পরই ফুল ও ফল ধরতে দেয়া উচিত।

পোকা ও রোগ দমন ঃ রোপণের পর গাছ অনেক রকমের পোকামাকড় ও রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ হতে পারে। রোপণের পর চারা গাছের কচি পাতা কাট উইভিল (Mango leaf cutting weevil) পোকার আক্রমণ বেশ দেখা যায়। এ পোকা আমগাছ ছাড়া অন্য কোনো গাছের ক্ষতি করে না। স্ত্রীপোকা কচি আমপাতার পিঠে মধ্যশিরার উভয় পাশে এক একটি করে প্রতি পাতায় ১০-২০ টি ডিম পারে। এর পর স্ত্রীপোকা ডিমপাড়া পাতাটির বোঁটার কাছাকাছি কেটে পাতাটি মাটিতে ফেলে দেয়।

আক্রান্ত আমগাছ কাটা কচিপাতার বোঁটাগুলো দেখে চেনা যায়। এ পোকার আক্রমণে চারা গাছের সব নতুন পাতা নষ্ট হয়ে যায়। মাটি থেকে কাটা নতুন পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করলে এই পোকার সংখ্যা কমিয়ে ফেলা সম্ভব। তাছাড়া গাছে কচি পাতা আসার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে ২ মি. লি. ডায়াজিনন ৫০ অথবা ৬০ ইসি বা ফেনিট্রোথায়ন (সুমিথিয়ন/ফলিথিয়ন) ৫০ ইসি বা লিবাসিড ৫০ ইসি স্প্রে করে এই পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

উলন্ত গাছের পরিচর্যা

উলন্ত আম গাছের যে সব পরিচর্যা দরকার তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

পরগাছা দমন ঃ আমগাছে একাধিক জাতের পরগাছা জন্মে। তবে লরানথাস (Loranthus) নামের পরগাছাটিই সচরাচর দেখা যায়। পরগাছাসমূহ শিকড়ের ন্যায় এক প্রকার হষ্টোরিয়া (Haustoria) হয় যা গাছের মধ্যে প্রবেশ করে রস শোষণ করে। ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পরে। এতে গাছের পাতা ছোট এবং ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং কোনো কোনো ডাল মরে যায়। এর ফলে গাছের ফলন মারাত্নক ভাবে

কমে যায়। এর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পরগাছাসম হ সম লে উৎপাটন করতে হবে। প্রতি বছর ফল আহরণের পর অথবা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই একাজ করার উপযুক্ত সময়। পরগাছা মুলতঃ ডালের অগ্রভাগে জন্মে। ডালের যে জায়গায় পরগাছার শিকড় ঢোকে এর ১০ সে. মি. নিচে ডালটিকে কেটে দিলে আর সেখানে পরগাছা জন্মাতে পারে না। পরগাছা ছোট অবস্থাতেই নষ্ট করে দেয়া উচিত। অর্কিড জাতীয় পরগাছা মোটা ডালে জন্মে। এগুলো বিশেষ ক্ষতিকর নয় এবং সহজেই তুলে ফেলা যায়।

ফল আহরণের পর অংগছাঁটাই গাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

অংগ ছাঁটাই ঃ ফল আহরণের পর গাছের মরা, রোগাক্রান্ত এবং অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে দেয়া গাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। এ গাছের ভিতরের দিকে অনেক ডালপালা আছে যেগুলো ফল দেয় না অথচ ছায়া সৃষ্টি করে পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। সুতরাং এসব ডালপালা ছাঁটাই করে দেয়াই ভালো যাতে গাছের ভিতর সর্বাধিক আলো প্রবেশ করতে পারে এবং বাতাস অনায়াসেই চলাচল করতে পারে।

সার প্রয়োগ ঃ ফলন্ত গাছের বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করতে হবে। সারণি-১ এ কি সার পরিমাণ কোনো বয়সের গাছে দিতে হবে দেখানো হয়েছে। সার বছরে দুই কিস্তি তে প্রয়োগ করতে হবে। জিপসাম ও জিংক সালফেট একান্ত র বছরে প্রয়োগ করলেও চলবে। প ূর্ণ বয়স্ক গাছের গোড়া থেকে ২-৩ মিটার দ র দিয়ে সার প্রয়োগ করাই শ্রেয়। মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে সার দেয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ ঃ ফুল আসা বা ফল ধরার জন্য বর্ষা মৌসুম শেষে কম পক্ষে তিনমাস বা মুকুল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শুষ্ক অবস্থা বিরাজ করা। মুকুল হওয়ার আগে সেচ বা বৃষ্টিপাত উভয়ই মারাত্নক ক্ষতিকর এবং সেক্ষেত্রে মুকুল না হয়ে নতুন পাতা বের হতে পারে। যাহোক আমের গুটি মটরদানার মত হওয়ার ১০-১৫ দিন পরপর ৩-৪ বার সেচ দিতে পারলে গুটি ঝরা বন্ধ হয় এবং আশানুরূপ উৎপাদন বেড়ে যায়। আম বাগানে সেচ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে দেয়া যেতে পারে। 'বেসিন' পদ্ধতিতে গাছের চারদিকে আইল দিয়ে পানি আবদ্ধ রাখতে। এক্ষেত্রে প্রতিগাছে আলাদা আলাদা সেচ দিতে হয়। ঢালু পাহাড়ী জমিতে স্প্রিংকলার বা ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যেতে পারে। এতে ভূমি ক্ষয়ের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আমগাছ গর্ত করেও সেচ দেয়া যেতে পারে। আমগাছের গোড়া থেকে দুই মিটার দূরত্বে ২০ সে. মি. গভীরে ১৫ সে. মি. প্রশস্ত ৪ টি গর্ত গাছের চারদিকে করতে হবে। প্রতিটি গর্তে পানি ভরে দিতে হবে এবং তা সম্পূর্ণ শোষণের পর পুনরায় পানির দ্বারা ভরে দিতে হবে। তাছাড়া সম্পূর্ণ বাগানে ঢালাও ভাবে সেচ দেয়া যেতে পারে। সেচ দিতে পারলে আমের সাইজ বড় হয়, দেখতে আকর্ষণীয় হয়। আমের গুণাগুণ উন্নততর হয় এবং ফলন বেশি হয়।

আম বা আমগাছ নানা ধরনের পোকামাকড় ও রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

পোকা ও রোগ দমন ঃ আম বা আমগাছ নানা ধরনের পোকামাকড় ও রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। তবে আমের হপারসম হ (The Mango Hoppers) দেশের সর্বত্রই আমের মারাত্নক ক্ষতি করে থাকে। তিনটি প্রজাতির হপার এর আক্রমণে আমের ফলন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই পোকাগুলোর অপ্রাপ্ত বয়স্ক নিম্ন এবং পূর্ণবয়স্ক উভয় অবস্থাতেই আম গাছের কচি পাতা ও ডগা থেকে রস চুষে খায়। সারা বছরেই এ পোকাগুলো আমগাছে থাকে। আম গাছের কাছে গেলে বা আমগাছের কান্ডে হাত রাখলে এ পোকাগুলোর স্পর্শ আমরা চোখ, মুখ ও শরীরে অনুভব করতে পারি। আমগাছে মুকুল আসার পর প্রতি মুকুলে অসংখ্য হপার নিম্ন দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নগুলো মুকুলের রস চুষে খায়। ফলে মুকুলে ফুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে যায়। তাছাড়া নিম্নগুলো মুকুলের রস চোষার সাথে সাথে মলদ্বার দিয়ে প্রচুর পরিমাণে আঁঠালো মধুরস (Honey dew) ত্যাগ করে যা মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় আটকে যায়। এই আঁঠালো পদার্থে ফুলের পরাগরেণু আটকে গিয়ে ফুলের পরাগায়ণ ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত করে। পাতা ও ফুলে আটকানো মধুরসে Sooty mould fungus জন্মায় এবং ফুল ও পাতা কালো বর্ণ ধারণ করে। ফলে আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় হপার আক্রান্ত মুকুলে কদাচিৎ ফল ধরে। হপারের আক্রমণের ফল আমের উৎপাদন ১০০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। হপার আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধিও কমে যায়। সুতরাং আম পেতে হলে হপার দমন করতে হবে। সত্যিকথা

বলতে কি সারাদেশে যথাসময়ে হপার দমন না করার জন্যই আমের ফলন এত কমে গেছে। নিম্নে এর দমন পদ্ধতি দেয়া হলো।

আমগাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে একবার এবং এর একমাস পর আর একবার প্রতি লিটার পানির সাথে এক মি. লি সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস/ ফিনম/বাসাথ্রিন) ১০ ইসি অথবা ডেসিস ২.৫ ইসি অথবা ০.৫ মি. লি সুমিসাইডিন ২০ ইসি মিশিয়ে আমগাছের কান্ড, ডাল, পাতা ও মুকুল ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করলে আমের হপার দমন করা যায়। আমের মুকুলের পাউডারী মিলডিউ রোগ দমনের জন্য টিল্ট ২৫০ ইসি (প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি. লি. হারে) অথবা সালফার গুড়া বা ইমালসান (প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম হারে) আমের হপার দমনে কীটনাশকের সাথে মিশে একই

সাথে স্প্রে করা উচিত। চুনাজাতীয় বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ কীটনাশকসম হের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে না। হপার ও পাউডারী মিলডিউ দমন করে আমের ফলন অনেকগুণ বাড়ানো সম্ভব। পাউডারী মিলডিউ আমের শুধু মুকুলেই দেখা যায়; অন্যান্য গাছের ন্যায় পাতায় দেখা যায় না।

তাছাড়া The Mango Fruit Weevil, The Mango Shoot-gall, Psyllid Bug, The Mango Stem Borer, The Mango Fruit Fly, The Mango Leaf-cutting Weevil, The Mango Defoliator, The Mango Leaf-gall Midges, The Mango Twig gall এগুলোও আমের মারাত্তক ক্ষতিকর পোকা। আমের মারাত্নক ক্ষতিকর রোগগুলো হচ্ছে- এ্যানথ্রাকনোজ, পাউডারী মিলডিউ, সুটি মোল্ড, ম্যালফরমেশন, ডাইব্যাক বা ডগা মরা, রেডরাষ্ট, স্ক্যাব, কাল দাগ, পিঙ্করোগ এবং ফল পঁচারোগ।

কোনো কোনো আম গাছ একবছর ভালো ফলন দেয় এবং পরবর্তী বছর একেবারেই ফলন দেয় না।

অনিয়মিত ফল ধারণ (Alternate Bearing) ঃ বেশিরভাগ বাণিজ্যিক জাতে এক বছর ফল দিলে পরের বছর ফল আসে না। এক বছর পরপর ফল দেয়াকে 'অনিয়মিত/একান্তর/দ্বিবার্ষিক' ফল দেয়া বলে। কোনো কোনো গাছ একবছর ভালো ফলন দেয় এবং পরবর্তী বছর একেবারেই ফলন দেয় না। একে Alternate Bearing বলে। আবার কোনো জাতে প্রথমে একটি গাছের কিছু সংখ্যক ডালে ফল আসে এবং পরবর্তী বছর অন্য সব ডালে ফল দেয়। এই জাতীয় গাছে প্রতি বছরেই মোটামুটি ফল ধরে থাকে। এগুলো মাঝারি ফলনশীল জাত বলে। কিছু কিছু জাত যেমন ভারতের নীলাম ও তোতাপুরী ববং আমাদের দেশের গুটি আম গাছগুলো প্রতিবছরেই বেশ ভালো ফল দিয়ে থাকে। এগুলোকে নিয়মিত ফলনশীল জাত বলে। এমনকি এসব নিয়মিত ফলনশীল জাতেও যদি কোনো বছর প্রচুর ফল দেয় তবে পরবর্তী বছর ফলন কম হয়। অর্থাৎ সব জাতের আমগাছেই অনিয়মিত ফল ধারণ বা একান্তর বছর ফলনশীলতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যে বছর গাছে ফল আসে সে বছরকে On-year এবং যে বছর ফল আসে না সে বছরকে Off-year বলে।

গাছের বৃদ্ধির নমুনা, শর্করা ও নাইট্রোজেনের সঞ্চয়, হরমোনের ভারসাম্য, আবহাওয়ার প্রভাব এবং গাছে ফলের সংখ্যা এসবেই একান্তর বছর ফলনশীলতার কারণ।

ফল আহরণ, ফলন ও সংরক্ষণ

আম পচনশীল। যথাসময়ে এবং সুষ্ঠুভাবে ফল সংগ্রহের ওপর ফলের পাকা, গুণাগুণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা অনেকটা নির্ভরশীল। আবাত্তি বা অপরিপক্ক আম আহরণ করলে জাতের প্রকৃত স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বেশি পাকা অবস্থায় সংগ্রহ করলে পোকা ও রোগজীবাণু সংক্রমণ বেশি হয়, সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায়।

ফল আহরণ ঃ কিছু কিছু লক্ষণ দেখে পরিপক্কতা বা আম আহরণের সময় শনাক্ত করা যায়। যেমন- (১) বোঁটার নিচের অংশে আম কিছুটা হলুদাভ রং ধারণ করে (২) আম পরিপক্ক অবস্থায় পানিতে ডুবে যায় (৩) স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ থেকে দু'একটা আধাপাকা আম ঝরে পড়লে (৪) আম পরিপক্ক হলে এর বোঁটা থেকে কষ বা আঠা বের হয় তা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং একটি স্বচ্ছ বিন্দুর আকারে জমা হয়। আম পরিপক্ক না হলে কষ মুক্তভাবে বের হয়ে আসে, এক জায়গায় জমা হয় না ও আমের ত্বক কুঁচকে যায় এবং (৫) ফল ধরার পর থেকে ৪-৫ মাসের মধ্যে আম পরিপক্ক অবস্থায় পৌঁছে।

তবে আম কতদিনে পাকবে তা নির্ভর করে জাত ও আবহাওয়ার ওপর। আমার গাছের সবগুলো ফল একই বয়সের হয় না। ফলে তাদের বাত্তি হওয়ার সময়ের মধ্যেও ব্যবধান থাকে। পরিপক্ক আম সবুজ ও শক্ত থাকতেই সংগ্রহ করতে হয়। বসত বাড়ির দু'একটি আমগাছের আম দু'তিন দফায় পেড়ে দীর্ঘদিন ধরে খাওয়া যায়। কিন্তু বাগানের ক্ষেত্রে এবং দূরবর্তী স্থানে প্রেরণের জন্য একটি গাছের আম একবারে সংগ্রহ করা সুবিধাজনক।

গাছে ঝাঁকি দিয়ে আম পাড়া অনুচিত। আঘাতপ্রাপ্ত আম সংরক্ষণ করা যায় না এবং তা খাবার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

আম পাড়া বা আহরণের পদ্ধতি ঃ গাছে ঝাঁকি দিয়ে আম পাড়া অনুচিত। আঘাতপ্রাপ্ত আম সংরক্ষণ করা যায় না এবং তা খাবার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যথা সম্ভব আম হাত দিয়ে পাড়াই উচিত। অথবা কোটার (Bamboo-pole-pickes) সাহায্যে আম পাড়া যায়। কোটার বংশদন্ডটি হালকা, শক্ত, সোজা এবং ২-৬ মিটার লম্বা। বংশ দন্ডের সরু প্রান্ত ভাগে একটি চাকের সাথে দড়ির তৈরি একটি জাল বা থলে থাকে। কোটার থলের মধ্যেই আমকে নিয়ে টান দিলেই আমটি বোঁটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থলের মধ্যে জমা হয়। মাটিতে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব বা গাছে উঠে এই কোটার সাহায্যে আম পাড়া উচিত।

বাছাইকরণ ঃ বাজারজাতকরণ এবং সংরক্ষণের আগে আম বাছাই করা উচিত। পাকা আম স্থানীয় বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হয়। ক্ষতযুক্ত ও মাটিতে পড়া আম বাদ দেয়াই ভালো। আর সব আম বড়, মাঝারী ও ছোট এই তিনটি গ্রেডে পৃথক করে প্যাকিং বাস্কেটে নেয়া উচিত।

ফলন ঃ জাত, পরিচর্যা এবং স্থানীয় আবহাওয়ার ওপর আমের ফলন নির্ভর করে। কলমের গাছ ৪র্থ বা ৫ম বছর থেকেই ফল দেয়া শুরু করে। প্রথম দু'এক বছর ১০-১৫ টি আম ধরে। পরবর্তী বছরগুলোতে এ সংখ্যা বেড়ে ৫০-৭৫ টি হয়। দশমবর্ষে গাছ প্রতি প্রায় ৫০০ টি আম পাওয়া যেতে পারে। ২০-৪০ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে অন-ইয়ার ১০০০-৩০০০ টি আম (গড় ওজন ২০০-৬০০ কেজি) পাওয়া যায়। কলমের গাছে উৎপাদন ৪০-৫০ বছর পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে তারপর ক্রমান্বয়ে কমে যেতে পারে।

সংরক্ষণ ঃ অধিক নিু তাপমাত্রায় আম সংবেদনশীল (Susceptible to cold injury)। অধিকাংশ জাতের আম ৫.৬-৭.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় বাঁশের ঝুড়ি, বাস্কেট বা ক্রেটে ৪-৭ সপ্তাহ ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। আম আহরণের পর এতে কোনো রোগ যেমন Stem end rot ev Black spot হতে না পারে বা সুটি মোলড নষ্ট করে আমের ত্বককে আকর্ষণীয় করা যায় সেজন্য আমকে ৫২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম পানিতে ১০ মিনিট ডুবিয়ে তারপর ঠান্ডা করে ৯.০ থেকে ১০.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চার সপ্তাহ পর্যন্ ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এসব আমে কোনো রকম দাগ পড়ে না।

অনুশীলন (Activity): *আমের বংশ বিস্তারের বিভিন্ন অঙ্গজ পদ্ধতিসম হের নাম লিখুন এবং সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।*

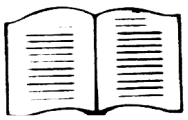

সারমর্ম ঃ আম উষ্ণ এবং অব-উষ্ণমন্ডলের ফল। বাংলাদেশ আমের আদি জন্মস্থান এলাকার অন্তর্ভুক্ত। আম উৎপাদনের জন্য ২০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা দরকার। সেচ সুবিধা থাকলে বছরে ২৫০ মি. মি. বৃষ্টিপাত যথেষ্ট। আম যেহেতু পরপরাগায়িত ফল; সেজন্যে একমাত্র কলমের সাহায্যেই কোনো জাতের বৈশিষ্ট বংশ পরম্পরায় ধরে রাখা যায়। আমের আশু, মধ্যম ও নাবী জাত আছে। 'টপ ওয়ার্কিং' পদ্ধতির মাধ্যমে আঁটির গাছটি কাংখিত কলমের গাছে রূপান্ি রিত করা সম্ভব। অনিয়মিত ফল ধারণ আম উৎপাদনে একটি প্রধান সমস্যা। ফল ধরার পর থেকে ৪-৫ মাসের মধ্যে আম পরিপক্ক হয়ে যায়। আমের ফলন গাছের বয়স ও জাতের ওপর নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে ‘সত্য’ এবং মিথ্যা হলে ‘মিথ্যা’ লিখুন।

ক) আমে খাদ্যপ্রাণ বি, বি-১ ও বি-২ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।
খ) পুষ্পমঞ্জরীতে শতকরা ৯০ ভাগ স্ত্রীফুল থাকে।
গ) আম উদ্ভিদতত্ত্বে ড্রুপ নামে পরিচিত।
ঘ) আমের আটি থেকে চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলার প্রয়োজন হয় না।
ঙ) কলমের গাছের বয়স ৩-৪ বছর পউর্ণ হওয়ার পরই ফুল ও ফল ধরতে দেওয়া উচিত।

২। শউন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) পাকা আম খাদ্যপ্রাণ .... তে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।
খ) একই পুষ্পমঞ্জরীতে ...., ... ও .... ফুল থাকে।
গ) উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মুক্তায়িত জাতের নাম .... ।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) কোন্‌টি বামন জাতের আম?
ক) গোপালভোগ
খ) আম্রপালি
গ) খিরসাপাত
ঘ) হিম সাগর

ii) ভারত উপমহাদেশে কত বৎসর ধরে আমের চাষ হচ্ছে?
ক) ২০০০ বৎসর
খ) ৩০০০ বৎসর
গ) ৪০০০ বৎসর
ঘ) ৫০০০ বৎসর

iii) বাংলাদেশের সবচেয়ে আগাম আমের জাত কোন্‌টি?
ক) গোপালভোগ
থ) খিরসাপাত
গ) ফজলি
ঘ) ল্যাংড়া

পাঠ ৭.২ লিচু

এ পাঠ শেষে আপনি –

- লিচুর উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- লিচুর উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- লিচুর জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন।
- চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উৎপত্তিস্থল

লিচুর উৎপত্তিস্থল চীনদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। এটা চীন দেশে ৩০০০ বৎসরের অধিক কাল ধরে চাষ হয়ে আসছে।

লিচুর উৎপত্তি চীনদেশে। সেখানে এর উৎপাদন সবচেয়ে বেশি এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল।

উৎপাদন

এফলটি চীনদেশের জনগনের অত্যন্ত প্রিয় ফল এবং অদ্যাবধি চীনদেশেই এর উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয়। উৎপাদনের দিক থেকে ইন্ডিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। অন্যান্য যে সব দেশে লিচুর প্রসার ঘটেছে সেদেশগুলো হচ্ছে- ইন্দো-চায়না, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ জাপান, তাইওয়ান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, মৌরিশাস, ওয়েষ্ট ইন্ডিজ, ব্রাজিল ববং যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই এবং ফ্লোরিডা। বাংলাদেশে এফলটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রবর্তন হয়। বাংলাদেশে অল্প বিস্তর সর্বত্রই বসতভিটায় লিচুগাছ দেখতে পাওয়া যায়। তবে ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোহর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে লিচুর চাষ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বা বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় ৪,০০০ হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ হয় এবং ১০,৫০০ টন লিচু উৎপাদিত হয়।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার ঃ বিভিন্ন জলবায়ুতে বিভিন্ন জাতের লিচুর পুষ্টিমান কমবেশি হয়ে থাকে। ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন জাতের চিনির পরিমাণ ৬.৭৪ থেকে ১৮.৮৬% পাওয়া গেছে। চিনি ছাড়াও ০.৭% আমিষ, ০.৩% চর্বি, ০.৭% খনিজ (বিশেষ করে ক্যালসিয়াম এবং ফসফোরাস) এবং খাদ্যপ্রাণ সি (৬৪ মি. গ্রা. প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে), এ বি-১ ও বি-২ লিচুতে পাওয়া গেছে। লিচু পাকা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও অনেক দেশে এর প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য খুবই জনপ্রিয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

লিচু Sapindaceae পরিবারের এবং Nephelae উপ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এ উপ-পরিবারে ১০০ টি এবহঁং এবং ১০০০ এর বেশি Species বা প্রজাতি রয়েছে। তবে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি ফলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেমন লিচু, রামবুটান ও আঁশফল। লিচুর বৈজ্ঞানিক নাম *Litchi chinensis*. এটি Nephelium litchi নামেও পরিচিত।

লিচুগাছ দ্বিবীজপত্রী, চিরহরিৎ ও বহুবর্ষজীবী। লিচুগাছ মধ্যম আকৃতির হয়ে থাকে। এটা ১০ মিটার বা আরও উঁচু হতে পারে। পাতা যৌগিক। এর চার থেকে সাতটি অনুপত্রক থাকে। প্রতিটি অনুপত্রক ৭ থেকে ১০ সে. মি. লম্বা হয়। পাতার ওপর দিক চকচকে ঘন সবুজ। কিন্তু নিচের দিক ধূসর-সবুজাভ। গাছের বাকল অগভীর এবং বাদামি রংয়ের। গাছের মূল অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিস্তৃত হয়।

ঈুষ্পমঞ্জুরী একটি যৌগিক রেসিম এবং প্রান্তিক প্রশাখায় বের হয়। পুষ্পমঞ্জুরী ধাপে ধাপে বের হয়।

পুষ্পমঞ্জরী একটি যৌগিক রেসিম (Compound raceme)। এগুলো প্রান্ি ক প্রশাখায় (Terminal branch) বের হয়। এতে উভলিঙ্গ এবং একলিঙ্গ ফুল থাকে। পুষ্পমঞ্জরীর উভলিঙ্গ এবং একলিঙ্গ ফুল একসাথে প্রস্ফুটিত হয় না। ফলে ফল ধারণের জন্য পরপরাগায়নের প্রয়োজন হয়। একবারেই সব পুষ্পমঞ্জরী বের হয় না। ধাপে ধাপে বের হয়। পরিপক্ক লিচুফলে একটি করে বীজ থাকে। মৌমাছি ও বিভিন্ন মাছি দ্বারা পরপরাগায়িত হয়ে প্রতি ঝোপায় ১৫-২০ টি ফল ধরে। ফল বিভিন্ন রং, আকৃতি ও সাইজের হয়ে থাকে। ফলের চারদিকে ভক্ষণযোগ্য অংশকে এরিল (Aril) বলে।

চিত্র ৭.২.১ঃ বোম্বাই জাতের একগুŽছ লিচু

জাতসমুহ ঃ লিচু যেহেতু পরপরাগায়িত এর অনেক স্থানীয় জাত সৃষ্টি হয়েছে। তবে এগুলো গুণেমানে খুবই উৎকৃষ্ট হয়। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে 'রাজশাহী লোকাল' ও 'দিনাজপুর লোকাল' জাত দু'টি বেশ উন্নতমানের। রাজশাহী লোকাল আশুজাত এবং দিনাজপুর লোকাল নাবিজাত। এছাড়া রাজশাহী অঞ্চলের 'বোম্বাই' লিচু, দিনাজপুরের 'বেদানা' এবং ঢাকার সোনারগাঁওয়ের 'কদমী' লিচু বেশ প্রসিদ্ধ।

চলি-শ দশকের শেষ ভাগে চীনদেশ থেকে চায়না-১, ২ ও ৩ এই তিনটি লিচুর জাত ঢাকার মনিপুর গবেষণা ফার্মে প্রবর্তন করা হয়। এগুলোর মধ্যে চায়না-২ এবং চায়না-৩ আজও প্রচলিত আছে। চায়না-৩ জাতটি খুবই উৎকৃষ্ট জাত হিসেবে পরিচিত। 'কদমী' লিচু জাতের ফল প্রায় দ্বিগুণ বড় হয় এবং বীজ তুলনাম লকভাবে ছোট এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ বেশি।

বংশ বিস্তার

যৌন পদ্ধতিতে অর্থাৎ বীজ দ্বারাও লিচুর বংশ বৃদ্ধি হয়। তবে লিচুর বংশবৃদ্ধির জন্য গুটি কলম উত্তম পদ্ধতি হিসেবে সর্বত্রই স্বীকৃত। রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত গাছেই গুটি কলম করতে হয়। এরকম সুস্থ গাছের এক বছর বয়সের ডাল যেগুলো উপরের দিকে সোজা বা ৪৫ ডিগ্রী কোনে হেলে আছে এসব ডালেই গুটিকলম করা হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে লিচুর গুটি কলম বাঁধার উপযুক্ত সময়। শিকড়

আসতে প্রায় দু'মাস সময় নেয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গুটি নামিয়ে যথাযথ পরিচর্যা নিলে এগুলো বেশির ভাগ টিকে যায়।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু ঃ লিচু অবউষ্ণ মন্ডলের ফল এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় এর চমৎকার বৃদ্ধি ঘটে। গ্রীষ্মকালের আর্দ্রতাবিহীন অত্যাধিক গরম এর চাষের জন্য ক্ষতিকর। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১৫০ সে. মি. এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০-৮০% লিচু চাষের উপযোগী। লিচু সমতল ভূমির ফসল হলেও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০০ মি. উচ্চতায় জন্মাতে পারে। গাছে ফুল আসার জন্য শীতাবেশ প্রয়োজন হয়।

মাটি ঃ লিচুগাছ বিভিন্ন ধরণের মাটিতে জন্মাতে পারে যদি তা পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত থাকে। মাটি দোআঁশ, জৈবসার সমৃদ্ধ এবং গভীর হলে খুবই ভালো। গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। মাটি কিছুটা অম্লহলে লিচুগাছের জন্য উত্তম কারণ মাইকোরাইজা (Mycorrhiza) ম্লমাটি পছন্দ করে। লিচুর শিকড় মাইকোরাইজা এর আশ্রয়স্থল এবং এরা পরস্পরের উপকার করে।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি তৈরি

বসতভিটায় দু'একটি গাছ রোপণ করতে চাইলে জমি তৈরি প্রয়োজন নাই। গাছ রোপণের গর্তগুলো (Planting pit) করলেই চলবে। কিন্তু লিচুর বাগান করতে চাইলে সে জমি সমান করে নিতে হবে এবং চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হবে।

রোপণের দ রত্ব ও রোপণের সময়

লিচু গাছ ১০ থ ১০ মিটার দূরত্বে রোপণ করতে হয়। ১০ মিটার দূরে দূরে লাইন টেনে লাইনে ১০ মিটার দূরে দূরে গাছ রোপণ করতে হবে। প্রথমেই মাপজোক করে কাঠি পুঁতে গাছ রোপণের স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। এরপর কাঠিটিকে কেন্দ্র করে এক মিটার গভীর করে ১ থ ১ মিটার সাইজের গর্ত খুঁড়তে হবে। এসময় 'টপ সয়েল' আলাদা রাখতে হয়। গাছ রোপণের ১০-১৫ দিন আগেই সার ও মাটি মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ফেলতে হবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসেই লিচুর চারা রোপণের উত্তম সময়। তবে যত্ন নিতে পারলে ভাদ্র-আশ্বিনেও রোপণ করা যেতে পারে।

জ্যৈষ্ঠ (May-June) মাসেই লিচুগাছ রোপণের উত্তম সময়। এসময় রোপণ করলে গাছ তাড়াতাড়ি লেগে উঠে এবং কম মারা যায়। তাছাড়া যত্ন নিতে পারলে ভাদ্র-আশ্বিনেও (August-September) লিচুগাছ রোপণ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ

প্রথমে 'টপ সয়েলের সাথে গর্তপ্রতি ১০ কেজি গোবর সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ফেলতে হবে। এরপর ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমপি সার গর্তের উপরের ২৫ সে. মি. মাটির মধ্যে হালকা কোপ দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। এখন রোপণের জায়গাটি কাঠি পুঁতে নিদিষ্ট করে রাখতে হবে। এর ১০-১৫ দিন পর লিচুর কলম উক্ত গর্তে রোপণ করা যাবে। রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ার মাটির বলটি না ভেঙ্গে যায়। এরপর গাছটি মাটিতে বসিয়ে চারদিকের মাটি পা দিয়ে শক্ত করে বসে দিতে হবে এবং রোপণের পরপরই সেচ দিতে হবে। যতদিন গাছ লেগে না ওঠে এবং বর্ষা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত সপ্তাহে দু'তিন দিন সেচ দেয়া ভালো। রোপণের পরপরই গাছের গোড়া যাতে বাতাসে বা জীবজন্তুতে না নড়ে সেজন্য সুতলী দিয়ে গাছটি কাঠিগুলোর সাথে বেঁধে দিতে হবে। পরবর্তী ১২ মাস পর্যন্ত কাঠিগুলো যথাস্থানে থাকা প্রয়োজন। মনে রাখা

দরকার লিচুগাছ খুবই স্পর্শকাতর। সহজেই মরে যায়। সুতরাং রোপণের পর এর সযত্ন পরিচর্যা দরকার।

পরিচর্যা

সার উপরি প্রয়োগ ও সেচ ঃ লিচুগাছে বছরে দু'বার সার দিতে হবে। প্রথম কিস্তি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তি ভাদ্র-আশ্বিন মাসে। গাছের সন্তোষজনক বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ দরকার। প্রথম চার বছর যে হারে সার দিতে হবে তা সারণি ২ এ দেয়া হলো।

সারণি ২ঃ প্রথম চার বছর লিচু গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ।

গাছের বয়স	গোবর সার কেজি/প্রতিগাছ/ প্রতিবছর	ইউরিয়া গ্রাম/প্রতিগাছ/ প্রতিবছর	টিএসপি গ্রাম/প্রতিগাছ/ প্রতিবছর	এমপি গ্রাম/প্রতিগাছ/ প্রতিবছর
১	৫	১৭০	৫০	১২৫
২	৫	২২০	৫০	১৭০
৩	৫	৩২০	১১০	২৫০
৪	৫	৫৫০	১৬০	৪২০

সম্পূর্ণ গোবর সার ও টিএসপি এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি প্রথম কিস্তিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে একসাথে গাছের গোড়ার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছের গোড়া থেকে ৫০ সে. মি. দূরত্বে সার প্রয়োগ করাই উত্তম। সার দেয়ার পরপরই সেচ প্রয়োগ করতে হবে। বাকী ইউরিয়া ও এমপি সার দ্বিতীয় কিস্তিতে ভাদ্র-জ্যৈষ্ঠ মাসে একইভাবে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর সেচ দেয়া ভালো। সার প্রয়োগ মাটির উর্বরতা, গাছের দূরত্ব ও বৃদ্ধি ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল ৫ বছর বা তদুর্দ্ধ বয়সের গাছে প্রতিবছর নিম্নোক্ত পরিমাণ সার দেয়া যেতে পারে।

গোবর সার- ১০ কেজি, ইউরিয়া-১২৫০ গ্রাম, টিএসপি-৪০০ গ্রাম ও এমপি-১০০০ গ্রাম। সম্পূর্ণ গোবর সার ও টিএসপি এবং অর্দ্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার গাছের গোড়া থেকে ৩০-৪০ সে. মি. দূরত্বে মাটির সাথে চাষ দিয়ে মিশে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। বাকী অর্দ্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার একইভাবে দ্বিতীয় কিস্তিতে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে এবং সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। এরপর ফলন্ত গাছে ফুল আসার পর থেকে শুরু করে ১৫-২০ দিন পরপর সেচ দিলে ফল বড় হয় এবং ফলন বাড়ে। পানির অভাব হলে ফল ঝরে পড়ে।

নার্সারিতে থাকতে এবং রোপণের প্রথম কয়েক বছর গাছের কিছু ট্রেনিং এবং প্রুনিং দরকার আছে।

ট্রেনিং এবং প্রুনিং ঃ ফলন্ত লিচুগাছে ট্রেনিং এবং প্রুনিং এর দরকার নাই। নার্সারিতে থাকতে এবং রোপণের পর কয়েক বছর গাছের কিছু ট্রেনিং এবং প্রুনিং দরকার আছে। যাতে গাছের একটি মাত্র প্রধান কান্ড কমপক্ষে এক থেকে দু'মিটার উঁচু হতে পারে। এজন্য পাশের অন্যান্য ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে। এরপর ৪-৫ টি ডালগাছের চতুর্দিকে বাড়তে দিতে হয় যাতে গাছ অন্তর্মুখী না হয়ে বহির্মুখী হয়। এতে গাছের ভিতর সরাসরি আলো বাতাস চলাচল করতে পারবে এবং এর ফলে রোগবালাই ও পোকামাকড় কম হবে। এছাড়া প্রতিবছর বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগে মরা ও রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করতে হয়।

লিচু ফল একবছর বয়সের প্রান্ত শাখায় হয়ে থাকে।

লিচু ফল এক বছর বয়সের প্রান্ত শাখায় হয়ে থাকে। ফল আহরণের সময় শাখার কিছু অংশ ফলসহ ভেঙ্গে নেয়া হয়। শাখার কিছু অংশ ভাঙ্গার ফলে নতুন শাখা-প্রশাখা বের হয় সেগুলো পরবর্তী বছর ফল দেয়। এর বেশি ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয় না।

রোগ ও পোকামাকড় দমন ঃ লিচুর তেমন কোনো মারাত্মক রোগ নাই। তবে Litchi Mite লিচুগাছের অতি ক্ষুদ্র মাকড় ও Litchi Fruit Borer লিচু ফলের বীজখেকো মাজরা পোকা লিচু ফলের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে।

লিচুগাছের পাতার অতি ক্ষুদ্র মাকড় ঃ আক্রান্ত লিচু গাছের পাতাগুলো মাকড়ের আক্রমনে লাল ভেলভেট এর মত দেখতে এবং পাতাগুলো কুঁকড়িয়ে ভালো পাতার তুলনায় আলাদা আকৃতি ও বর্ণের হয়। পাতা ছাড়াও কচি ফলের গায়ে লাল রংয়ের মরিচার মত মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায়। মাকড়ের

আক্রমণে পাতা মরে গাছ দুর্বল হয় এবং ফল উৎপাদন কমে যায়। ফল সংগ্রহের পর আক্রান্ত সকল পত্রগুচ্ছ কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যেসব এলাকায় মাকড়ের আক্রমণ বেশি দেখা যায় সেখানে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে একবার করে প্রতি লিটার পানির সাথে ১.০ মি. লি. নিউরোন ৫০০ ইসি বা ১.০ গ্রা. টর্ক ৫০ ডব্লিউ পি বা ২.০ মি. লি. কেলথেন ৪২ এম এফ মিশিয়ে গাছের পাতায় ভালোভাবে

স্প্রে করতে হবে। যেখানে আক্রমণ কম সেখানে আক্রান্ত পত্রগুচ্ছ কেটে পুড়ে ফেলতে হবে অথবা মাকড়নাশক ঔষধ স্প্রে করে মাকড় দমন করতে হবে। উল্লিখিত মাকড়নাশক ঔষধগুলো পাওয়া না গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মি. লি. ডায়জিনন ৬০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করলে মাকড় দমন সম্ভব হবে।

লিচু ফলের বীজখেকো মাজরা পোকা ঃ কোনো কোনো এলাকায় লিচু ফলের বোটার দিকে ফলের খোসার নিচেই মাজরা পোকার কীড়া দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে পোকা দমনের জন্য ফল পাকার ১৫-২০ দিন আগে প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মি. লি. সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস) ১০ ইসি বা

ডেসিস ২.৫ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করে ফলগুলো ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। তাইলে এ পোকা দমন করা সম্ভব হবে।

মালচিং ঃ মাটিতে রস কম থাকলে লিচুগাছের বৃদ্ধি কমে যায়। তাই সম্ভব হলে রোপণের ৪-৫ বছর

পর্যন্ত বর্ষার শেষে সার দিয়ে সেচ দেয়ার পরপরই খড় বা শুকনো ঘাস/আগাছা বা কচুরিপানা দিয়ে মালচিং দিলে গাছের শিকড় বৃদ্ধি ও শক্তিশালী হয়। মাটিতে রস ধরে রাখে, বৃষ্টি বা সেচের পানি মাটিতে বেশি ঢুকতে পারে, আগাছা দমন হয় এবং গাছের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

ফুল বের হওয়া ও ফল ধারণ ঃ গুটি কলমের গাছে তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের গাছেই ফুল আসে। তবে চার বছর বয়সের আগে কোনমতেই ফল রাখা উচিত নয় অর্থাৎ সেসব গাছের ফুল ছাঁটাই করে দিতে হবে। বীজের গাছে ফুল আসতে ৮-১২ বছর লাগতে পারে। ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে লিচুগাছে ফুল আসে। ফুল আসার পূর্বে কয়েকমাস গাছের বৃদ্ধি বন্ধ থাকে এবং থাকা প্রয়োজন। শুষ্ক মৌসুম ও শীত গাছের বৃদ্ধি প্রাকৃতিকভাবেই বন্ধ করতে সাহায্য করে। সেজন্য এদেশের আবহাওয়া লিচু উৎপাদনের জন্য খুবই অনুকূল। তবে ফুল আসার পর থেকে ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর সেচ উপকারী। অতি শুষ্ক আবহাওয়ায় ফুল ও ফল ঝড়ে পড়ে। সেচ ফল বড় করে এবং ফলন বৃদ্ধি করে।

ফুল বের হওয়ার পর থেকে পরাগায়িত হওয়া পর্যন্ত ২৬ থেকে ৩৫ দিন সময় লাগে। মৌমাছি এবং অন্যান্য মাছি লিচুর পরপরাগায়ণে সাহায্য করে। যদিও লিচু গাছে অসংখ্য ফুল হয় কিন্তু এর শতকরা অল্পভাগই ফল ধারণ করে। আর ফল যত ধরে তার অল্প অংশই বড় হয়। ফল যত ধরে তার শতকরা ৩.০ থেকে ৩৯.৬ ভাগ ফল বড় হয়।

ফল আহরণ ও সংরক্ষণ

আহরণ ঃ ফল ধারণ থেকে শুরু করে ৫৫-৬০ দিন পরেই ফল আহরণের উপযুক্ত হয়। ফলের রংই ফল আহরণের সময় হয়েছে কি না বলে দেবে। তবে এসময় ফলের ত্বকের উপরের কাঁটাগুলো (Tubercles) সমান হয়ে যায়। গাছে সব ফল একসাথে পাকে। তাই গাছের যে অংশের ফল পাকে সে অংশের ফলই পাড়া উচিত। অর্থাৎ এক গাছে কয়েকবার ফল পাড়তে হবে। শাখার কিছু অংশ পাতাসহ গোছায় গোছায় লিচু ফল আহরণ করতে হয়। এতে লিচু বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়।

শাখার কিছু পাতাসহ গোছায় গোছায় লিচুফল আহরণ করতে হয়। এতে লিচু বেশিদিন সংরক্ষণ করা।

যথাযথ পরিচর্যা পেলে লিচুগাছ ১০০ বছর পর্যন্ত লাভজনক ফল দিতে পারে। একটি পূর্ণ বয়স্ক লিচুগাছ থেকে বছরে ৮০ থেকে ১৫০ কেজি ফল আহরণ করা যেতে পারে।

সংরক্ষণ ঃ আহরণের পরপরই ফল খারাপ হওয়া শুরু করে। বিশেষ করে ফল আহরণের পর যদি রোদে রাখা হয় তবে ফল তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে লিচু ফল ২.২ থেকে ৩.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় একমাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। সুতরাং সংরক্ষণের জন্য হিমাগার পাওয়া গেলে লিচু আরও মাসাধিককাল বাজারজাত করা সম্ভব হ'ত।

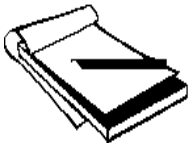

অনুশীলন (Activity) ঃ *লিচু গাছে ট্রেনিং এবং প্রুনিং এর কেন দরকার হয় এবং এটা গাছের কোন্ পর্যায়ে করা উচিত। বীজ দ্বারা লিচুর বংশ বিস্ তারের কয়েকটি অসুবিধা বর্ণনা করুন।*

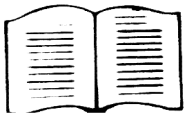

সারমর্ম ঃ বাংলাদেশে লিচু অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রবর্তন করা হয়। এটা অবউষ্ণমন্ডলীয় ফল এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় এর চাষ ভালো হয়। জৈবসার সমৃদ্ধ সুনিষ্কাশনযুক্ত গভীর দোআঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য উত্তম। পুষ্পমঞ্জরী ধাপে ধাপে বের হয় এবং পুষ্পমঞ্জরীর উভলিঙ্গ এবং একলিঙ্গ ফুল একসাথে ফোটেনা। সুতরাং পরপরাগায়ণের প্রয়োজন হয়। রাজশাহী, দিনাজপুর এবং ঢাকার সোনাগাঁয়ের লিচু প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের লিচুগাছের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ বীজের চারা থেকেই উৎপন্ন। তবে জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য গুটিকলম উত্তম পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। জ্যৈষ্ঠ মাসেই চারা রোপণের সঠিক সময়। নার্সারিতে বা রোপণের প্রথম কয়েক বছর গাছের কিছুটা ট্রেনিং এবং প্র€নিং এর দরকার আছে। লিচুফল একবছর বয়সের প্রান্ শাখায় হয়ে থাকে। শাখার কিছু অংশ পাতাসহ গোছায় গোছায় লিচুফল আহরণ করতে হয়। একটি পূর্ণ বয়স্ক লিচুগাছ থেকে বছরে ৮০-১৫০ কেজি ফল আহরণ করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৭.২

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) পুষ্পমঞ্জরী একটি যোগিক রেসিম এবং এগুলো প্রান্তিক প্রশাখায় বের হয়।

খ) ফল থেকে বীজ বের করার দিন থেকেই বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বাড়তে থাকে।

গ) ফলন্ত লিচুগাছে ট্রেনিং এবং প্রুনিং করতে হয়।

ঘ) শাখার কিছু অংশ পাতাসহ গোছায় গোছায় লিচুফল আহরণ করতে হয়। এতে লিচু বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়।

২। শ ন্যস্থান প রণ কর€ন

ক) লিচুফলের চারদিকে ভক্ষণযোগ্য অংশকে ..... বলে।

খ) পুষ্পমঞ্জরীর উভলিঙ্গ এবং একলিঙ্গ ফুল একসাথে প্রস্ফুটিত হয় না। ফলে ফল ধারণের জন্য ..... প্রয়োজন হয়।

গ) ..... মাসেই লিচুগাছ রোপণের উত্তম সময়।

ঘ) ফুল ধারণ থেকে শুরু করে ..... দিন পরেই ফল আহরণের উপযুক্ত হয়।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) কোন্‌টি আস্ত জাতের লিচু?

ক) রাজশাহী লোকাল

খ) দিনাজপুর লোকাল

গ) বেদানা

ঘ) চায়না - ৩

ii) কোন্ জাতের লিচু সবচেয়ে বড় ও বিচি ছোট?

ক) বেদানা

খ) বোম্বাই

গ) কদমী

ঘ) চায়না - ৩

পাঠ ৭.৩ কাঁঠাল

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কাঁঠালের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- কাঁঠালের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কাঁঠালের জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কাঁঠালের চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উৎপত্তিস্থল

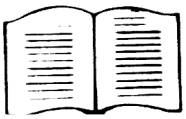

কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। সাধারণ মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ফল এটি। ইন্ডিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের 'ওয়েষ্টার্ন ঘাট' জঙ্গলে কাঁঠালের উৎপত্তিস্থল (Centre of origin)। কাঁঠাল এ অঞ্চলে স্মরণাতীতকাল থেকে চাষ হয়ে আসছে। পরবর্তীতে অনেক উষ্ণমন্ডলীয় দেশে বিশেষ করে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে কাঁঠালের প্রবর্তন হয় এবং সেসব দেশের আবহাওয়ার সাথে কাঁঠাল সাফল্যজনকভাবে খাপ খেয়ে নেয়।

উৎপাদন

কাঁঠাল বর্তমানে উভয় গোলার্ধের উষ্ণমন্ডলীয় দেশসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং ওয়েষ্ট ইন্ডিজে এর ব্যাপক চাষ হয়। ইন্ডিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে এ ফল বেশ জনপ্রিয়।

বাংলাদেশে কাঁঠালের ব্যাপক চাষ হয় এবং এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম বাণিজ্যিক ফল। বাংলাদেশে ২৪৫৮০ হেক্টর জমিতে কাঁঠালের গাছ আছে এবং প্রতিবছর ২৫৩২৫০ টন কাঁঠাল উৎপাদন হয়ে থাকে। উৎপাদনের দিক থেকে এটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে অর্থাৎ কলার পরই এর স্থান। মোট ফল উৎপাদনের শতকরা ১৬.৬ ভাগই হচ্ছে কাঁঠাল। বাংলাদেশের সর্বত্রই কাঁঠালের চাষ হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি কাঁঠাল জন্মে সাভার অঞ্চলে, গাজীপুর জেলা, যশোহর, কুষ্টিয়া, ভালুকা, মধুপুর, মৌলভীবাজার, রামগড়, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

পুষ্টিমান

কাঁঠাল ভক্ষণযোগ্য ফলের মধ্যে সর্ববৃহৎ ফল। কাঁঠাল কয়েক কেজি ওজন থেকে শুরু করে ৫০ কেজি বা তদুর্দ্ধ হতে পারে।

কাঁঠাল ভক্ষণযোগ্য ফলের মধ্যে সর্ববৃহৎ ফল। কাঁঠাল কয়েক কেজি ওজন থেকে শুরু করে ৫০ কেজি বা তদুর্দ্ধ হতে পারে। কাঁঠাল ফল কাঁচা এবং পাকা উভয় অবস্থাতেই খাওয়া যায়। কাঁচা ফল সব্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঁঠালের বিভিন্নতা দেখা গেছে। এর ভক্ষণযোগ্য অংশ (বীজসহ কোয়া যেহেতু বীজও ভক্ষণযোগ্য) শতকরা ২৫ থেকে ৭৫ ভাগ পাওয়া গেছে। পাকা ফলের টিএসএস বা মিষ্টতা ১০ থেকে ৩০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাকা ফল খাদ্যপ্রাণ এ সমৃদ্ধ।

ব্যবহার

কাঁঠালের কাঠে উই লাগেনা ও ছাতা পড়েনা। সেজন্য আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কাঠ থেকে হলুদ রং বের করে বৌদ্ধ পুরোহিতদের কাপড় রং করা হয়। কাঁঠালের কাঁচা পাতা গোবাদি পশুর প্রিয় খাদ্য। এর শুকনো পাতা এবং শাখা-প্রশাখা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয়। ঔষধ হিসেবে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে যেমন- তাজা বীজের রস ডাইরিয়া এবং আমাশয় ভালো করে। এর কাঁচা পাতা গরম করে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে, ঘায়ের ওপর বা কানের সমস্যায় এবং ব্যথা উপশমে বেশ কার্যকর।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

কাঁঠাল Moraceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus heterophyllus* Lamk. আর একটি হচ্ছে *Artocarpus chaplasha* Roxb.এটি সাধারণত চাপালিশ বা চাপলাশ নামেই পরিচিত।

কাঁঠালগাছ বহুবর্ষজীবী, দ্বিবীজপত্রী, চিরহরিৎ বৃক্ষ। এগাছ ১০-১৫ মি. উচু হয়ে থাকে। গাছের যে কোনো জায়গা আঘাতপ্রাপ্ত হলে সাদা কষ (Latex) বের হয়। বাকল অমসৃণ এবং গাঢ়বাদামি রংয়ের হয়ে থাকে। পাতা গাঢ় সবুজ, উপবৃত্তাকার এবং একান্তরভাবে সাজানো। পাতার নিচের ভাগ অবশ্য মলিন সবুজ। পাতার কিনারা সমান। তবে ছোট গাছের পাতায় এক থেকে দু'জোড়া Lobbed থাকতে পারে।

স্ত্রীফুল ও পুরুষফুল একই গাছে পৃথক পৃথকভাবে ধরে। প্রধান কান্ড থেকে যে ফুলগুলো বের হয় সেগুলো স্ত্রীফুল।

স্ত্রীফুল ও পুরুষ ফুল একই গাছে পৃথক পৃথকভাবে ধরে। সাধারণতঃ প্রধান কান্ড থেকে যে ফুলগুলো বের হয় সেগুলো প্রায়ই স্ত্রীফুল হয়ে থাকে। আবার প্রান্ত শাখা থেকে যেগুলো ফুল বের হয় সেগুলো প্রায় সবই পুরুষ ফুল হয়ে থাকে। পুষ্পমঞ্জরীদন্ডে অনেক ফুল একত্রে আসে। স্পাইক ধরনের এই পুষ্পমঞ্জরী দুটি ডেগা (Sheath) দ্বারা ঢাকা থাকে। প্রতি বোঁটায় কয়েকটি করে মঞ্জুরী থাকে এবং প্রথমাবস্থায় এগুলো খয়েরী ডেগা দ্বারা আবৃত থাকে। স্ত্রীমঞ্জুরীর উপরিভাগ দানাদার ও অমসৃণ হয় এবং মঞ্জুরীদন্ড মোটা ও খাট হয়। পুরুষ মঞ্জুরী পুষ্পপুট (Perianth) দ্বারা ঢাকা। পুংকেশর পরাগরেণু বিদারণের সময় পুষ্পপুটকে বিদীর্ণ করে মঞ্জুরীর উপরিভাবে চলে আসে। মঞ্জুরীর উপরিভাগ কয়েকদিনের মধ্যেই হলুদ পরাগরেণুতে ভরে যায়। পরাগরেণু বিদারণের ৩-৪ দিনের মধ্যেই পর-পরাগায়ন এবং গর্ভাধান সম্পন্ন হয়।

কাঁঠালের ফল বহুফলের (Multiple fruits) সমষ্টি এবং সরোসিস নামে পরিচিত। একটি কাঁঠালের মধ্যে অনেক কোয়া থাকে। প্রত্যেকটি কোয়াই একটি ফল।

চিত্র ৭.৩.১ঃ ফলসহ কাঠাল গাছ

জাতসম হ

কাঁঠাল পরপরাগায়িত এবং এর বংশ বিস্তার বীজ দ্বারা হয়ে থাকে। ফলে প্রত্যেকটি গাছই একটি আলাদা জাত।

যেহেতু কাঁঠাল পরপরাগায়িত এবং এর বংশবিস্তার সাধারণত বীজ দ্বারা হয়ে থাকে, প্রত্যেকটি গাছই একটি আলাদা জাত। একটি গাছের কাঁঠালের সাথে আর একটি গাছের কাঁঠালের মিল নাই। যাহোক বহু কাঁঠাল গাছ যেগুলো ফলের গুণাগুণের ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে নাম করা হয়। যেমন 'গোলাপী'- যে ফলগুলোতে গোলাপের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আবার 'চাম্পা'-যে ফলগুলোতে কাঁঠালীচাঁপার সুবাস পাওয়া যায়।

যে কাঁঠালগুলো ফল হিসেবে খাবার উপযুক্ত সেগুলো চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে যেমন–

কাঁঠাল ফলকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে যেমন (১) খাজা (২) গালা (৩) মধ্যম এবং (৪) হাজারী।

(১) খাজা শ্রেণি ঃ এ শ্রেণির ফল কচকচে (Crispy) এবং অপেক্ষাকৃত শক্ত। রস কম এবং কোয়া টিপলেও রস বের হয় না। মিষ্টি কমবেশি হতে পারে।

(২) গালা শ্রেণি ঃ পাকার পর কোয়াগুলো নরম এবং খুব রসাল হয়। কোয়া চিপে সহজেই রস বের করা যায়। এগুলো সাধারণত খুব বেশি মিষ্টি হয়ে থাকে।

(৩) মধ্যম শ্রেণি ঃ পাকা ফলের কোয়াগুলো ততশক্ত বা গালা নয়।

(৪) হাজারী কাঁঠাল ঃ এশ্রেণির গাছের গোড়া থেকে শুর€ করে ছোট ছোট প্রচুর কাঁঠাল ধরে সেজন্যেই হাজারী কাঁঠাল বলা হয়। এজাতের বীজের গাছে মাতৃগুণাগুণ বজায় থাকে। সম্ভবতঃ এ শ্রেণির গাছ স্বপরাগায়িত। চিত্র- ৭.৩.১ এ কাঁঠাল গাছে ফল ধারণ দেখানো হয়েছে। পরাগায়ণ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্ঁন্ন না হলে ফলের আকারের বিকৃতি ঘটে।

জলবায়ু ও মাটি

কাঁঠাল উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফল। প্রচুর বৃষ্টি ও আর্দ্র আবহাওয়া কাঁঠালের জন্য উপযোগী। আমাদের দেশের তাপমাত্রা কাঁঠাল গাছের বৃদ্ধির জন্য খুব উপকারী। ২৫ থেকে ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা কাঁঠাল গাছের বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে ভালো। কাঁঠাল গাছ মোটেই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত জমিতে কাঁঠাল ভালো জন্মে।

বংশ বিস্ ার

নির্বাচিত উন্নতজাত হয় কলমের সাহায্যে অথবা নিয়ন্ িত পরা-গায়ণের মাধ্যমে সৃষ্ট বীজের সাহায্য বংশ বিস্ ার করা যেতে

কাঁঠাল খুবই পরপরাগায়িত ফসল। বীজ থেলকে গাছ লাগালে সে গাছে কখনও মাতৃগাছের গুণাগুণ থাকে না। সুতরাং কোনো সুনির্দ্দিষ্ট জাত ধরে রাখতে হলে অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশবিস্ ার খুবই প্রয়োজন। নির্বাচিত উন্নতজাত হয় কলমের সাহায্যে অথবা নিয়ন্ িত পরাগায়ণের মাধ্যমে সৃষ্ট বীজের সাহায্যে করা যেতে পারে। যাহোক কাঁঠাল সাধারণত বীজের সাহায্যেই বিস্ ার লাভ করে থাকে। বীজতলা দ্র€ত পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু স্থানে করতে হবে। বীজতলার মাটি এক মিটার গভীর করে ভালোভাবে তৈরি করতে হবে এবং মাটির সমতল থেকে ২০ থেকে ২৫ সে. মি. উঁচু করাই উত্তম হবে। বীজতলার সাইজ ১ থ ৩ মি. হতে পারে অথবা এক মিটার প্রশস্ এবং লম্বায় যত ইঁছে করা যেতে পারে। ১ থ ৩ মি. সাইজের বীজতলা তৈরির সময় ৪০ কেজির মত জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে এবং বীজতলা তৈরি শেষে উপরের ২০-২৫ সে. মি. মাটির মধ্যে প্রতি বীজতলায় আধা কেজি টিএসপি সার প্রয়োগ করে হালকা কুপিয়ে মিশে দিতে হবে। পলিব্যাগেও চারা করা যেতে পারে। এর জন্য মাটি তৈরি করে নেয়া ভালো, এক্ষেত্রে মাটি, বালি এবং জৈব সার ১ঃ১ঃ১ হারে মিশিয়ে তা দিয়ে ৩০ থেকে ৪৫ সে. মি. উঁচু পলিব্যাগ কমপক্ষে ২.৫ সে. মি. ফাঁক রেখে ভরাতে হবে এবং বীজতলাতেও ৩০ সে. মি. দূরত্বে চারটি সারি করে সারিতে ৩০ সে. মি. দূরে দূরে ২.৫ সে. মি. গভীর করে বীজ রোপণ করা হয়। বীজ শুকিয়ে গেলে আর গজায় না। সুতরাং নির্বাচিত কাঁঠাল থেকে বীজ

বের করে বড় বড় বীজগুলো সাথেসাথে রোপণ করাই উত্তম। এক বা দুবছরের চারা মাটির বলসহ উঠিয়ে বিতরণ করা যেতে পারে। কাঁঠালের বীজ সরাসরি নির্বাচিত জমিতেও রোপণের পরামর্শ দেয়া হয়। এতে ম লশিকড় নষ্ট হয় না এবং এসব গাছ ভালো ফলন দেয়। সেক্ষেত্রে প্রতি গর্তে ৩/৪ টি বীজ রোপণ করা হয় এবং চারা বের হবার পর প্রতি গর্তে একটি করে চারা বাড়তে দেয়া হয়। ১×১×১ মিটার সাইজের গর্ত তৈরির পর মাটির সাথে ১০ কেজি জৈবসার ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি মিশিয়ে গর্ত ভরাট করা ১০-১৫ দিন পর বীজ ২.৫ সে. মি. গভীরে রোপণ করতে হয়। বীজ রোপণের কয়েক দিনের মধ্যে চারা গজিয়ে থাকে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসেই কাঁঠালের মৌসুমে বীজ রোপণ করা হয়। যদি কেহ কলমের গাছ লাগাতে চান তবে ভিনিয়ার বা ফাটল কলম (Cleft grafting) অথবা ষ্টোন গ্রাফটিং যেমন আমের বেলায় বলা হয়েছে একই নিয়মে করা যাবে। তবে সাফল্য কিছুটা কম হয়।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি নির্বাচন

জমিতে বন্যার পানি প্রবেশ করে না বা বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না এমন জায়গা কাঁঠালগাছ রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

রোপণের সময়

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বীজ রোপণের সময়। কারণ তখনই কাঁঠাল পাওয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বীজ রোপণের সময়। নির্বাচিত জায়গায় সরাসরি বীজ রোপণ করতে চাইলে এসময়েই চারা রোপণ করতে হবে। তবে বীজতলায় বা পলিব্যাগে চারা করে যত্ন নিতে পারলে বছরের যে কোনো সময় রোপণ করা যেতে পারে। তবে গাছ রোপণের পর তাড়াতাড়ি লেগে যাওয়ার জন্য (Establish) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই চারা রোপণ করার উত্তম সময়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ

জমি কয়েকটি চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হয়। কাঁঠাল গাছ সাধারণত ১২ থ ১২ মি. দ রত্বে রোপণ করা হয়। এ দ রত্বে হেক্টর প্রতি ৭০ টি গাছ রোপণ করা যায়। প্রতি সারিতে ১২ মি. দ রত্বে কাঠি পুঁতে চারা বা বীজ রোপণের স্থান নির্ধারণ করে নিতে হয়। সারি থেকে সারির দ রত্ব এক মিটার হবে। কাঠিটিকে কেন্দ্র করে এক মিটার গভীর করে ১ থ ১ মিটার সাইজের গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত তৈরির সময় উপরের মাটি আলাদা রাখা ভালো। এই আলাদা মাটির সাথে প্রতি গর্তের জন্য ২০ থেকে ৩০ কেজি গোবরসার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হয়। এতে হেক্টর প্রতি দেড় থেকে দুই টন গোবর সারের প্রয়োজন হয়। গর্ত ভরাট করার পর গর্তের উপরের ২০ থেকে ২৫ সে. মি. মাটির মধ্যে হালকা কোপ দিয়ে ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার মিশে দিতে হবে। এর ১০ থেকে ১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হয়। রোপণের সময় চারার বয়স এক বা দুই বছর হতে পারে। তবে চারা উঠানোর সময় Tap root সহ মাটি বল করে চারা উঠানো হয়। খেয়াল করতে হবে চারা উঠানোর সময় Tap root নষ্ট না হয়। চারা সোজা করে বসাতে হবে। এরপর চারদিকের মাটি শক্তকরে চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপরই পানি দিতে হয়। চারা রোপণের পরপরই এর দু'পাশে দুটি কাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে বা জন্তু জানোয়ারে গাছের গোড়া না নাড়াতে পারে।

পরিচর্যা

সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা ঃ বড় কাঁঠাল গাছে সেচ দেয়া হয় না। তবে চারা রোপণের পর ২-৩ বছর পর্যন্ত খরা মৌসুমে নিয়মিত অবশ্যেই সেচ দিতে হবে। কাঁঠালের বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

কাঁঠালের পাতা গরু-ছাগলের অত্যন্ত প্রিয় খাবার। সুতরাং গরু-ছাগলের থেকে রক্ষা করার জন্য খাঁচী দেয়াই উত্তম।

সার প্রয়োগ

বিভিন্ন বয়সের গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ সারণি ৩ এ দেখানো হলো।

সারণি ৩ ঃ বিভিন্ন বয়সে গাছে বিভিন্ন সার প্রয়োগের পরিমাণ

সার	৫ বছর পর্যন্ত	৬-১০ বছর পর্যন্	১০ বছরের
গোবর (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২৫০	৫০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০	৫০০	১০০০
এমপি (গ্রাম)	২৫০	৫০০	১০০০

সম্পূর্ণ গোবরসার ও টিএসপি সার এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার বর্ষার শুরুতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

মাসে গোড়া থেকে অন্ততঃ ৫০ সে. মি. দ রত্বে গাছের চারদিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার বর্ষা শেষে ভাদ্র-আশ্বিনে একইভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সার ডিবলিং পদ্ধতিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। গাছের বয়স যতই বাড়বে গাছের

গোড়া থেকে সার দেয়ার দ রত্ব ততই বাড়াতে হবে। ২০-২৫ বছরের প র্ণ বয়স্ক কাঁঠালের বাগানে দুটো সারির মাঝখানে দিয়ে সার ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশে দেয়াই সহজ। তবে মাটিতে তেমন রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই জলাবদ্ধতা না হয় সেদিকে খুব খেয়াল করতে হবে।

অঙ্গছাঁটাই

কাঁঠাল গাছের কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান। তাই কান্ড বাড়াতে হলে অঙ্গছাঁটাইয়ের প্রয়োজন।

কাঁঠাল গাছের কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান। তাই অনেকে চায় এর কান্ড ৫ থেকে ১০ মি. লম্বা হউক। সমতল ভূমিতে কান্ড ২-৩ মিটার উঁচু হতেই শাখা-প্রশাখা বের হতে চায়। প্রথমতঃ রোপণের পর লম্বা খাঁচী দিয়ে শাখা-প্রশাখা ছাড়াই গাছ ২-৩ মি. উঁচু করা যায়। এরপর কান্ড বাড়াতে চাইলে বর্ষার শুরুতে কান্ড বাদে অন্য ডালপালা ছেটে দিতে হয়। অঙ্গছাটায়ের স্থানে 'বোরদো পেষ্ট' বা ডাইথেন এম-৪৫ প্রয়োগ করা উচিত। তা না হলে পোকা বা রোগের আক্রমনে গাছের বা কাঠের ক্ষতি হবে।

তাছাড়া ফল আহরণের পর ফলের বোঁটা কেটে ফেলতে হয়। মরা, রোগাক্রান্ত ডালপালা প্রতি বছরই

বর্ষা শুর€ হওয়ার আগে কেটে পরিষ্কার করে দিতে হবে। গাছের বৃদ্ধি হলে গাছের ভিতরের কিছু শাখা-প্রশাখা ছেটে দিলে আলো-বাতাস ঢুকতে পারে। ফলে রোগবালাই ও পোকামাকড় কম হয়।

ফুল ধরা, পরাগায়ণ ও ফল ধারণ

কাঁঠাল গাছে ফল আসতে প্রায় ৭-৮ বছর লাগে। সুতরাং কাঁঠাল বাগানে এসময় আন্তঃফসল করা যেতে পারে।

কাঁঠাল গাছে ফল আসতে প্রায় ৭-৮ বছর লাগে। গাছে সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফুল আসে। স্ত্রীফুল ও পুরুষফুল আলাদাভাবে একই গাছে আসে (Monoecious)। অমৌসুমী ফলের জন্য

কোনো কোনো গাছে সারা বছর বা বছরের কোনো কোনো সময় ফুল আসে। গাছে শতকরা ৯০ ভাগই পুরুষফুল হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো গাছে শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত স্ত্রীফুল হতে পারে। স্ত্রীফুল প্রধান কান্ডে বা শাখায় আসে। পুরুষ ফুল শাখা-প্রশাখায় আসে। বাতাসের সাহায্যে পরপরাগায়ণ হয়ে থাকে। যদি পুষ্পমঞ্জরীর সব ফুল নিষেক না হয় তবে ফলের আকার স্বাভাবিক হয় না। স্ত্রীফুল নিষেক না হলে ঝরে পড়ে। ফল বসন্ত ও গ্রীষ্মে বৃদ্ধি পায়।

পোকামাকড় দমন ঃ কাঁঠালের মুচি ও ফলের মাজরা পোকা প্রধান ক্ষতিকর পোকা হিসেবে গন্য করা হয়। এ পোকার আক্রমণে মুচি (ফুল) ঝরে যায়। সুতরাং মুচি আসার সময় প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মি. লি. সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস) ১০ ইসি বা ১.০ মি. লি. ডেসিস ২.৫ ইসি বা ০.৫ মি. লি. ফেনভ্যালিরেট (সুমিসাইডিন) ২০ ইসি বা ২.০ মি. লি. ফেনিট্রোথিয়ন (সুমিথায়ন) ৫০ ইসি বা ডায়জিনন ৫০ ইসি স্পে করে ফুল বা মুচি ভিজিয়ে দিতে হবে এবং ১৫ দিন পরপর এক বা দু'বার স্পে করলেই এ পোকা দমন করা যাবে।

রোগ দমন ঃ Rhizopus Rot কাঁঠালের একটি মারাত্নক রোগ। এ রোগের জীবাণু পুরুষ ফুল এবং কচি ফলে আক্রমণ করে। এর ফলে ফল ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া ফল ও ফুলসম হ বাগান থেকে সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এবং বোরদো মিকচার (২ঃ২ঃ৫০) দিয়ে স্প্রে করে সব ফুল ভিজে দিতে হবে।

ফল আহরণ

সবজি হিসেবে খাবার জন্য যতদিন বীজ শক্ত না হয় ততদিন কাঁঠাল আহরণ করা যেতে পারে। তবে ফল পাকতে ফলধারণের পর ৯০ থেকে ১১০ দিন সময় নেয়। গাছে দু'একটা ফল পাকলেই ঘ্রানে বুঝতে পারা যায়। তখন সব ফল একসাথে অথবা গাছে উঠে হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে সেগুলো শব্দ ড্যাব ড্যাব করে সেগুলোই শুধু আহরণ করতে হয়। তাহলে ফলের গুণাগুণ ভালো হয়। বোঁটার কিছু অংশ রেখে ফল কেটে নামাতে হয়।

ফল পাকতে ফলধারণের পর ৯০ থেকে ১১০ দিন সময় নেয়।

ফলন

গাছের বয়স এবং ফলের সাইজের ওপর ফলের সংখ্যা ও ফলন নির্ভর করে। ৭-৮ বছর বয়সের গাছে ফল আসলেও ২০-২৫ বছর বয়সের গাছকেই প র্ণ বয়স্ক ধরা হয়। এসময়ে প্রতি গাছে ১০০ থেকে ১৫০ টি ফল ধরতে পারে। ফলের ওজন সাধারণতঃ ৫ কেজি থেকে ১০ কেজি হয়ে থাকে। তবে 'হাজারী' জাতের গাছে অসংখ্য ফল ধরে। গাছে গোড়া থেকে ফল ধরে এবং ফলের সাইজ ২-৩ কেজির বেশি হয় না।

ফল আহরণের পর ৩ থেকে ৭ দিনের মধ্যেই ফল পেঁকে যায়। বাত্তি (Matured) ফল আহরণ করলে ফল পাকা সমস্যা নয়।

***অনুশীলন (Activity)ঃ** কাঁঠালে কীভাবে পরপরাগায়ণ সম্স্ন্ন হয় তা বর্ণনা কর€ন। খাজা কাঁঠাল এবং গিলা কাঁঠালের পার্থক্য বর্ণনা কর€ন।*

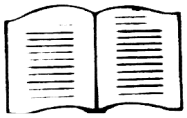

সারমর্মঃ কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। অভাবের সময় সাধারণ মানুষ কাঁঠালফলকে সম্½ রক খাবার হিসেবে ব্যবহার করে। কাঁচাফল সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঁঠাল উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভালো জন্মে। এটা যৌগিক ফল যা সরোসিস নামে পরিচিত। কাঁঠালের প্রত্যেকটি

কোয়াই এক একটি ফল। কাঁঠাল পরপরাগায়িত এবং এর বংশ বিস্তার বীজ দ্বারা হয়ে থাকে। কাঁঠালের চারটি শ্রেণি রয়েছে যেমন (১) খাজা (২) গালা (৩) মধ্যম এবং (৪) হাজারী। কাঁঠালগাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ বীজ রোপণের সময়। কাঁঠাল এর কাঠ খুব ম ল্যবান তাই অঙ্গছাঁটাই করে কান্ড বাড়ানো হয়। কাঁঠালগাছে ফল আসতে ৭-৮ বছর লাগে। স্ত্রীফুল ও পুরুষফুল আলাদাভাবে একই গাছে আসে। স্ত্রীফুল প্রধান কান্ডে বা শাখায় আসে। পুরুষফুল শাখায় প্রশাখায় আসে। ফল পাকতে ফল ধারণের পর ৯০ থেকে ১১০ দিন সময় নেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) স্ত্রীফুল ও পুরুষফুল একই গাছে পৃথক পৃথকভাবে ধরে।

খ) ফলের ভোতাঁর উপরিভাগে অনেক কাঁটা থাকে। কাঁটার সংখ্যা যত ফুলের সংখ্যাও তত হবে।

গ) কাঁঠাল ভক্ষণযোগ্য ফলের মধ্যে ছোট ফল।

ঘ) হাজারী কাঁঠাল জাতের বীজের গাছে মাতৃগুণাগুণ বজায় থাকে না।

ঙ) গাছে সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফুল আসে।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) কাঁঠালের ফল বহু ফলের সমষ্টি এবং .....নামেই পরিচিত।

খ) ফল পাকতে ফল ধারণের পর .....থেকে ..... দিন সময় নেয়।

গ) স্ত্রীফুল..... ... না হলে ঝরে পড়ে।

ঙ) পুরুষ মঞ্জরী ..... দ্বারা ঢাকা থাকে।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

র) কাঠালের উৎপত্তিস্থল কোন্‌টি?

- ক) শ্রীলঙ্কা
- খ) মিয়ানমার
- গ) ভারত
- ঘ) মালয়েশিয়া

রর) কোন্‌টি কাঠালের রোগ?

- ক) ফুট রট
- খ) রাইজফাস রট
- গ) স্টেম রট
- ঘ) পাতা ঝরা

পাঠ ৭.৪ পেয়ারা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পেয়ারার উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পেয়ারার উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্ ার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পেয়ারার জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পেয়ারার চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উৎপত্তিস্থল

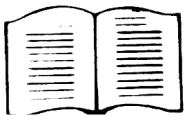

পেয়ারা দক্ষিণ আমেরিকার ফল। মেক্সিকো থেকে পেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই এর উৎপত্তিস্থল বলে মনে করা হয়। সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই পর্তুগীজরা পেয়ারা ভারতে প্রবর্তন করে এবং খুব দ্রুত এটি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে উভয় গোলার্দ্ধের উষ্ণমন্ডলীয় দেশসমূহে এর আবাদ হচ্ছে। প্রধান যে সমস্ত দেশে পেয়ারার চাষ হয় সেগুলো হচ্ছে - ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, চীনদেশ, তাইওয়ান, কিউবা, মেক্সিকো, পেরু, হাওয়াই, ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়া। বাংলাদেশে মাত্র ৪,৯০০ হেক্টর জমিতে পেয়ারার চাষ হয় এবং ২৮,০০০ টন পেয়ারা উৎপাদিত হয়। পুষ্টিমানের বিচারে পেয়ারা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে দেশের প্রতি বাড়িতে একাধিক পেয়ারার গাছ থাকা বাঞ্চনীয়।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

> পেয়ারাকে প্রাচ্যের আপেল বলা হয়। পেয়ারা খাদ্যপ্রাণ সি এবং পেকটিন সমৃদ্ধ।

পেয়ারা একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল। পেয়ারা খাদ্যপ্রাণ সি এবং পেকটিন সমৃদ্ধ। টাটকা পেয়ারার প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ২৪২ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ সি ও ২৮০ আই ইউ খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। পুষ্টিমান অবশ্য বিভিন্ন জাতে তারতম্য হয়ে থাকে। তাছাড়া কতটুকু বাত্তি হয়েছে তার ওপরও নির্ভর করে। সাধারণভাবে যে পেয়ারার ভিতর লাল বা গোলাপী সেগুলোতে খাদ্যপ্রাণ সি কম থাকে। মোটামুটি প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য পেয়ারাতে ৫৫ থেকে ৫২৯ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ সি। তাছাড়া পেয়ারা ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাস সমৃদ্ধ। পেয়ারা থেকে জ্যাম, জেলী, চাটনী ইত্যাদি তৈরি করা হয়। পেয়ারাতে পেকর্টিনের পরিমাণ বেশি থাকার ফলে জেলীর গুণগতমান বেড়ে যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

> পেয়ারা বেরী জাতীয় ফল। ফুল উভয়লিঙ্গী এবং বায়ুপ্রবাহ ও কীটপতঙ্গের সাহায্যে পরপরা-গায়ণ হয়।

> বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজীপেয়ারার জাত মুক্তায়িত করেছে। এছাড়া বারি পেয়ারা-২ নামে আরও একটি জাত সম্প্রতি মুক্তায়িত করেছে।

পেয়ারা গাছ দ্বিবীজপত্রী, বহুবর্ষজীবী ও চিরহরিৎ বৃক্ষ। গাছ মাঝারী আকারের হয় যা ৩ থেকে ১০ মি. পর্যন্ উঁচু হতে পারে। এর শিকড় মাটির খুব ভিতরে প্রবেশ করে না। বাকল পাতলা এবং সবুজ থেকে লাল-তামাটে এবং খোসার মত খুলে খুলে পরে। কচি শাখা চার কোণাকার হয়ে থাকে এবং গায়ে শুঙ্গ (Pubescent) থাকে। পাতা পরস্পর বিপরীতমুখী, বোঁটা ৩-১০ এমএম লম্বা এবং পাতা উপবৃত্তকার লম্বাটে। পাতার নিচের শিরাগুলো খুবই স্পষ্ট। পাতার অক্ষ থেকে মুকুল এককভাবে বের হয় অথবা পুষ্পমঞ্জরীতে ২-৩ টি ফুল উৎপন্ন হয়। ফুলে বৃতি ৪-৬ টি, পাপড়ি ৪-৫ টি দেখতে সাদা, পুংকেশর অনেক, কিন্তু একটি স্ ীকেশর থাকে। ২৫ থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ ফুল ফুটে থাকে। ফুল উভয়লিঙ্গী এবং বায়ুপ্রবাহ ও কীটপতঙ্গের সাহায্যে পরাগায়ণ হয়। পেয়ারা একটি বেরী জাতীয় ফল। পেয়ারা গুংঃধপবধব পরিবারের অন্ ভুর্ক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Psidium guajava* খ. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাত রয়েছে। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানা অন্ ভুর্ক্ত কাঞ্চননগর পাহাড়ী অঞ্চলের 'কাঞ্চননগর' জাত, ব্রাক্ষনবাড়িয়ার সমতল ভূমির মুকুন্দপুরী জাত এবং ঝালকাঠি জেলার জোয়ারভাটা অঞ্চলে আবাদ হয় স্বরূপকাঠি জাত। তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

কাজীপেয়ারা নামে একটি পেয়ারার জাত মুক্তায়িত করেছে যা সারা দেশে বিস্ ার লাভ করেছে। বারি পেয়ারা-২ নামে আরো একটি জাত সম্প্রতি মুক্তায়িত হয়েছে।

চিত্র ৭.৪.১ঃ ফলসহ পেয়ারা গাছ

বংশ বিস্ ার

পেয়ারা বীজের সাহায্যে বংশ-বিস্ ার করে থাকে। বাডিং, গ্রাফটিং ও গুটি কলমের সাহায্যে অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ

পেয়ারা বীজের সাহায্যে বংশবিস্ ার করে থাকে। যেহেতু পেয়ারা পরপরাগায়িত বীজের গাছের ফলে মাতৃগাছের গুণাগুণ হুবহু থাকেনা। এছাড়া গুটিকলমের সাহায্যে পেয়ারার বংশ বিস্ ার করা যেতে পারে। যদিও বাডিং ও গ্রাফটিং এর সাহায্যে পেয়ারার বংশ বিস্ ার হতে পারে তবুও এদেশে গুটি কলমই বহুল প্রচলিত।

রোপণের সময় ও দ রত্ব ঃ বর্ষা শুরুর আগে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে যথাযথ পরিচর্যা করতে পারলে অতিরিক্ত বর্ষার সময় বাদে বছরের আর সব সময় পেয়ারার চারা বা কলম রোপণ করা যাবে। পেয়ারার চারা বা কলম ৫ থ ৫ মিটার বা ৬ থ ৬ মিটার দ রত্বে রোপণ করা হয়। এ দ রত্বে রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ৪০০ অথবা ৩০০ টি গাছের প্রয়োজন হয়।

জলবায়ু ও মাটি

উষ্ণ ও অবউষ্ণ মন্ডলের জলবায়ু পেয়ারা উৎপাদনের জন্য উপযোগী।

উষ্ণ ও অবউষ্ণ মন্ডলের জলবায়ু পেয়ারা উৎপাদনের জন্য উপযোগী। যে সব অঞ্চলে কয়েকমাস শীতকাল আছে সেখানে পেয়ারার ফলন আরও ভালো হয় এবং গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ মি. উচ্চতায় পেয়ারা জন্মিতে পারে। পেয়ারার আবাদের জন্য ২৩-২৮ সেলসিয়াস তাপমাত্রা

উত্তম। ১০০ থেকে ২০০ এম এম বৃষ্টিপাত পেয়ারা উৎপাদনের জন্য ভালো। ফুল আসার সময় অবশ্যই শুকনো মৌসুম হওয়া চাই। পেয়ারা গাছ বেশ শক্ত। সব রকম মাটিতেই পেয়ারা জন্মিতে পাতে। তবে পেয়ারা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারেনা। মাটির পি এইচ ৪.৫ থেকে ৮.২ পর্যন্ত হলেও পেয়ারার আবাদ সফল হতে পারে। পেয়ারা গাছের শিকর মাটির মাত্র ২০ সে. মি. এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি তৈরি ও চারা রোপণ

জমি অনেক বার চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হয়। এরপর ৫০ সে. মি. গভীর করে ৫০ থ ৫০ সে. মি. সাইজের গর্ত খুড়ে রোপণের জায়গা তৈরি করতে হয়। সাধারণত ৫ থ ৫ মি. দ রত্বে গর্তগুলো করা হয়। এরপর প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর সার এবং ২৫০ গ্রাম টিএসপি অথবা এক কেজি হাড়ের গুড়া মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করা প্রয়োজন। তারপর চারা বা কলম রোপণ করা যাবে। রোপণের পর গাছের চার দিকের মাটি শক্ত করে বসে দিতে হবে এবং গোড়া বাতাসে বা জীবজন্তুর দ্বারা না নড়ে সেজন্য গাছটির পাশে কাঠি পুঁতে সুতলী দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। রোপণের পরপরই সেচ দিতে হবে এবং বৃষ্টি না হলে পানি দেয়া অব্যাহত রাখতে হবে যতদিন গাছ লেগে না ওঠে। গাছ লেগে উঠতে প্রায় এক মাস সময় নেয়।

সার প্রয়োগ

জমিতে এরপর যে পরিমাণ সার দিতে হবে তা সারণি ৪ এ দেখানো হলো।

সারণি ৪ ঃ বিভিন্ন বয়সের গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ

সার	রোপণের সময়	গাছের বয়স					
		১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর	৬ষ্ঠ বছর বা তদুর্দ্ধ
গোবর সার (কেজি)	১০-১৫	১০	১০	১৫	২০	২৫	২৫
ইউরিয়া (গ্রাম)	-	১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	৫০০	৫০০
এমপি (গ্রাম)	-	১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৫০০

সারণি ৪ এ উলি-খিত সার দুই কিস্তি তে দিতে হবে। বর্ষা শুর€র আগে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম কিস্তি তে সম্পূর্ণ গোবর সার ও টিএসপি এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার গাছের চারদিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে। তবে পাহাড়ের ঢালে ডিবলিং পদ্ধতিতে সার দেয়াই ভালো। দ্বিতীয় কিস্তি সার বর্ষা মৌসুম শেষে ভাদ্র-আশ্বিনে দিতে হয়। এ সময় বাকী অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার দেয়া হয়। যথা সময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি ৪ এ বর্ণিত সার ছাড়াও কখনও কখনও জিংক বা সালফার বা মলিবডেনামের অভাব দেখা দিতে পারে। এগুলোর অভাবে গাছের পাতা ছোট হতে পারে, পাতার শিরার মধ্যবর্তী জায়গার সবুজ

কমে যেতে পারে। পাতা ও ফলের সংখ্যা কম হতে পারে ইত্যাদি। এক্ষেত্রে জিংক সালফেট, জিপসাম বা বরিক এসিড প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পরিচর্যা

সেচ ঃ যদিও পেয়ারা গাছ বেশ খরা সহ্য করতে পারে কিন্তু ফলন আশানুরূপ পেতে হলে শুষ্ক মৌসুমে ১৫ দন পরপর সেচ দিতে হবে। তাছাড়া সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পেয়ারা গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্যে প্র€নিং ও ট্রেনিং খুব

প্র€নিং ও ট্রেনিং ঃ গাছ যাতে শাখা-প্রশাখা ছাড়ার আগে অন্ততঃ এক মিটার উপরে ওঠে এজন্য প্রথম একটি শাখা বাড়তে দেয়া হয় এরপর প্রধান শাখাটির মাথা কেটে দিলে চারদিক থেকে অনেক কুঁড়ি বের হয়। এগুলো থেকে গাছের চারদিকে চারটি রেখে বাদবাকীগুলো ভেঙ্গে দিতে হয়। এই চারটি শাখা যেন সোজা ওপরদিকে না উঠে চারদিকে প্রসারিত হয় সেজন্য অনেক সময় খুঁটি পুঁতে রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হয়। এগুলো যখন ৫০ সে. মি. বা একমিটার লম্বা হয় তখন এগুলোর মাথা কেটে দিয়ে সেখান থেকে দুটি করে শাখা বাড়তে দেয়া উচিত। এমনিভাবে ১৬ টি মজবুত শাখা হলে এরপর আর

প্র€নিং ও ট্রেনিং এর প্রয়োজন নাই। তবে মরা ও রোগাক্রান্ত ডাল বা ওয়াটার সাকার বর্ষা শুর€র আগে এবং পরে ছেটে দেয়াই ভালো।

ফুল আসা, ফল ধারণ ও ফলের বৃদ্ধি

পেয়ারা গাছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বছরের প্রথম ফুল আসে এবং ভাদ্র-আশ্বিনে দ্বিতীয় দফায় ফুল আসে।

পেয়ারা গাছে বছরে সাধারণত দুবার ফুল আসে। ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) মাসে বছরের প্রথম ফুল আসে এবং ভাদ্র-আশ্বিনে (সেপ্টম্বর-অক্টোবরে) দ্বিতীয় দফায় ফুল আসে। মুকুল বের হওয়া থেকে ফুল ফুটতে ২০ থেকে ২২ দিন সময় নেয়। আবার ফুল বের হওয়া থেকে ফল আহরণের উপযুক্ত হতে ১৪০ থেকে ১৬০ দিন সময় নেয়। আষাঢ়-শ্রাবণে (জুলাই-আগস্ট) পেয়ারা আহরণ করা হয়। আবার মাঘ-ফাল্গুনে পেয়ারা আহরণ করা হয়।

রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ

পোকা মাকড় দমন ঃ পেয়ারা গাছে মিলিবাগের আক্রমণ সাধারণত বেশি দেখা যায়। পেয়ারা গাছের পাতা ও ফলের এ পোকা দেখা যায়। এগুলো এক জায়গায় একটি লাইনে অনেকগুলো থাকে। নড়াচড়া করে না। এদের গা তুলোট আবরণযুক্ত। এ পোকাগুলো রস চুষে খেয়ে কচি কান্ড, পাতা ও

ফলের ক্ষতি করে। মিলিবাগ আক্রান্ত পাতা কচি কান্ড এবং ফল থেকে মিলিবাগ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে মারতে হবে। অথবা প্রতি লিটার পানির সাথে নগস বা ডেনকাভ্যাপন ১০০ ইসি ২.০ মি. লি. অথবা

ডাইমেক্রন ১০০ এসসিডবি-উ, ১.০ মি. লি. হারে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করে মিলিবাগ দমন করা সম্ভব।

রোগ দমন

উইল্ট রোগ (ডরষঃ ফরংবধংব) ঃ এর আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ছোট ডালপালাও শুকিয়ে যেতে থাকে। এমন কি হঠাৎ একদিন গাছটি মরে যায়। এ রোগ দমনের তেমন কোনো ব্যবস্থা নাই। তবে বাগানের সঠিক পরিচর্যা এ রোগ দমনে সাহায্য করে।

লীফ স্পট রোগ (Leaf spot disease) ঃ এর আক্রমণে পাতা ও ফলে ছোট ছোট বাদামি রং এর দাগ দেখা যায়। এ দাগগুলোর মাঝখানে কাল দাগ হয়। এ রোগ গাছের ফলের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। যে কোনো কপার ছত্রাকনাশক ১০-১৫ দিন পরপর ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা যায়।

ফল আহরণ ও ফলন

ফল আহরণের উপযুক্ত হলে ফলের সবুজ রং পরিবর্তন হয়ে হলুদাভ সবুজ বা হলুদ হয়।

ফল আহরণের উপযুক্ত হলে ফলের সবুজ রং পরিবর্তন হয়ে হলুদাভ সবুজ বা হলুদ হয়। তখন প্রতিটি ফল এক এক করে সম্ভব হলে সিকেটার দিয়ে কেটে আহরণ করতে হয়। পাঁচ বছরের গাছ ১০০ থকে ২৫০ টি ফল দিতে পারে যার ওজন প্রায় ৩০ কেজি।

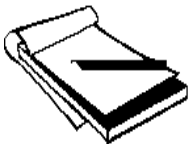

অনুশীলন (Activity) *ঃ পেয়ারার পুষ্টিমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। গুটিকলম কীভাবে করা হয় সংক্ষেপে বর্ণনা কর€ম।*

সারমর্মঃ উষ্ণ ও অবউষ্ণমন্ডলের জলবায়ু পেয়ারা উৎপাদনের জন্য উপযোগী। পেয়ারা আবাদের জন্য ২৩-২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১০০-২০০ মি. মি. বৃষ্টিপাত উত্তম। পেয়ারা সবমাটিতেই জন্মে তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। গাছের শিকড় মাটির খুব ভিতরে প্রবেশ করে না। গাছের গোড়া থেকেই শাখা প্রশাখা বের হতে থাকে। ফুল উভয়লিঙ্গি। বায়ুপ্রবাহ ও কীটপতঙ্গের সাহায্যে বীজ থেকে বংশ বৃদ্ধি হলেও কোনো কোনো জায়গায় যুগের পর যুগ একই জাতের আবাদ হওয়ায় জাতগুলো স্থিতি হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজী পেয়ারা এবং বারি পেয়ারা-২ নামে পেয়ারার দু'টি জাত মুক্তায়িত করেছে। অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারের জন্য বাডিং, গ্রাফটিং, গুটিকলম ইত্যাদি খুবই উপযোগী। গাছের সঠিক ও সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য প্র€নিং এবং ট্রেনিং এর প্রয়োজন আছে। পেয়ারা গাছে বছরে দু'বার ফুল আসে। পাঁচ বছরের গাছে ১০০-২৫০ টি ফল দিতে পারে যার ওজন প্রায় ৩০ কেজি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৪

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) পেয়ারা খাদ্যপ্রাণ সি এবং পেকটিন সমৃদ্ধ ফল নয়।
খ) ফুল উভয়লিঙ্গি নয়; বায়ুপ্রবাহ ও পতঙ্গের সাহায্যে পরাগায়ণ ঘটে না।
গ) গাছের বাকল পাতলা এবং খোসার মত খুলে খুলে পড়ে।
ঘ) বীজ থেকে বংশ বৃদ্ধি হলেও কোনো কোনো জায়গায় যুগেরে পর যুগ একই জাতের আবাদ হওয়ায় জাতগুলো স্থিতি হয়েছে।
ঙ) ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বছরের প্রথম ফুল আসে এবং ভাদ্র-আশ্বিনে দ্বিতীয় দফায় ফুল আসে।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) কচি শাখা চার কোণাকার হয়ে থাকে এবং গায়ে ..... থাকে।
খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট .....নামে একটি পেয়ারার জাত মুক্তায়িত করেছে যা সারাদেশে বিস্তার লাভ করেছে।
গ) ফুল বের হওয়া থেকে ফল আহরণের উপযুক্ত হতে ..... থেকে ..... দিন সময় নেয়।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) পেয়ারা গাছে সাধারণত বৎসরে কয়বার ফল আসে?
   ক) ১ বার
   খ) ২ বার
   গ) ৩ বার
   ঘ) ৪ বার

ii) পেয়ারার উৎপত্তিস্থল কোন্‌টি?
   ক) ভারত
   খ) দক্ষিণ আমেরিকা
   গ) ফ্লোরিন্ডা
   ঘ) থাইল্যান্ড

পাঠ ৭.৫ লেবু জাতীয় ফল

এ পাঠ শেষে আপনি –

- লেবু জাতীয় ফলের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- লেবু জাতীয় ফলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- লেবু জাতীয় ফলের জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লেবু জাতীয় ফলের চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

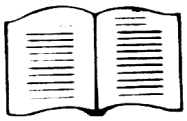

উৎপত্তিস্থল

অধিকাংশ লেবুজাতীয় ফলের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে দক্ষিণ-প র্ব এশিয়ার উষ্ণ ও অবউষ্ণ অঞ্চলের দেশসমূহে; বিশেষ করে ইন্ডিয়া ও চীনদেশে এবং এ দু'দেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। দক্ষিণ চীন দেশকে নিব্বর্ণিত লেবু ফলসম হের উৎপত্তিস্থল (Centre of origin) হিসেবে গণ্য করা হয়।

মালয়েশিয়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইন্ডিয়ার উত্তর-প বাঞ্চলে ও বাংলাদেশকে লেবু (খবসড়হং) এবং জামির (খরসব) এর উৎপত্তিস্থল বলে মনে করা হয়। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মরহুম অধ্যাপক হগসন এর মতে লেবু এবং জামিরের প্রজাতিসম হ যেমন- Rangpur lime (*C. limon*), Indian sweet lime (*C. limettioides*), Rough lemon (*C. jambhuri*) ইত্যাদি, আদি উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আসাম ও বাংলাদেশ।

উৎপাদন

বেশির ভাগ লেবুজাতীয় ফসল যেমন কমলা, মাল্টা, এবং গ্রেপফ্রুট অবউষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মে। তবে লেবু, জামির, জাম্বুরা এবং কমলা উষ্ণ মন্ডল অঞ্চলেও বেশি জন্মে। আর্দ্র, উষ্ণ ও অবউষ্ণ মন্ডলে লেবু জাতীয় ফলের রং সবুজ থাকে এবং খুব সুস্বাদু হয় না। বাংলাদেশে কম সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর। এদেশে লেবুজাতীয় ফলের উৎপাদন খুব বেশি নয়। বাংলাদেশ হঁেছ লেবুজাতীয় ফল বিশেষ করে লেবু ও জামিরের উৎপত্তিস্থল। তবু এদেশে লেবুজাতীয় ফলের তেমন কোনো বাণিজ্যিক কাঠামো গড়ে ওঠে নাই। বিভিন্ন লেবুজাতীয় ফলের জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো।

লেবু জাতীয় ফল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (টন)
লেবু ও জামির	৩২৩৯	৭০০০
কমলা	৪০৫	১০০০
জাম্বুরা	২৪২৯	৭০০০
অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল	২৪২৯	৮০০০
মোট -	৮৫০২	২৩০০০

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

পুষ্টিমান

লেবু জাতীয় সব ফল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। বিভিন্ন লেবুজাতীয় ফলের পুষ্টিমান সারণি ১ এ দেয়া হলো।

সারণি ১ ঃ প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে বিভিন্ন লেবুজাতীয় ফলের পুষ্টিমান

	কমলা	মাল্টা	জাম্বুরা	জামির	লেবু
আমিষ (%)	০.৭	০.৮	০.৫	১.৫	০.৩
চর্ব্বি (%)	০.১	০.৩	০.৩	১.০	০.৭
শর্করা (%)	৯.৭	৯.৩	৮.৫	১০.৯	১০.০
ক্যালসিয়াম (মি. গ্রা.)	২২.০	৪০.০	৩৭.০	৯০.০	৪০.০
লৌহ (মি. গ্রা.)	০.৩	০.৭	০.২	০.৩	২.৩
ক্যারোটিন (মি. গ্রা.)	-	০	১২০.০	১৫.০	০
খাদ্যপ্রাণ বি-১ (মি. গ্রা.)	০.০৪	-	০.০৬	০.০২	সামান্য
খাদ্যপ্রাণ বি-২ (মি. গ্রা.)	০.০১	-	০.০৪	০.০৩	০.০৩
খাদ্যপ্রাণ সি (মি. গ্রা.)	৪০.০	৫০.০	১০৫.০	৬৩.০	৪৭.০

ব্যবহার

লেবুর রস থেকে জেলী, মার্মালেড ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা হয়। ফলের খোসা থেকে আচার ও চাটনী বানানো যায়। সিলেটের অনেক জায়গায় কিছু লেবুর জাত সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। এছাড়া প্রসাধনী, ঔষধ এবং সাইট্রিক এসিড তৈরিতে লেবুজাতীয় ফল ব্যবহার করা হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

লেবুজাতীয় ফল Rutaceae পরিবার এবং Genus citrus এর অন্তর্ভুক্ত। Citrus এর অধীনে প্রায় ১৬০ টি প্রজাতি বা ঝঢ়বপরবং রয়েছে। এগুলোর মধ্যে যে সকল প্রজাতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ হয়ে থাকে সেগুলো মোট চারটি উদ্যানতাত্ত্বিক শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে যেমন-

ধ) Sweet orange (মাল্টা) ঃ *Citrus sinensis*
ন) গধহফধৎরহ (কমলা) ঃ *Citrus reticulata*
প) Lime (কাগজী) ঃ *Citrus aurantifolia*
ফ) Lemon (পাতি লেবু) ঃ *Citrus limon*
ব) Pummelo (জাম্বুরা) ঃ *Citrus grandis*
ভ) Graper fruit (গ্রেপ ফ্রুট) ঃ *Citrus Paradisi*

অধিকাংশ লেবুজাতীয় ফলের গাছ ছোট ছোট বৃক্ষ। কান্ড সরু বা মোটা তবে গোলাকার। কচি শাখা অবশ্য কোণাকার (Angular) হয়। তাছাড়া কচি শাখা-প্রশাখার পত্রকক্ষে কাঁটা থাকে। পাতা একক পত্রফলক বিশিষ্ট। অনেক প্রজাতিতে পাতার বোঁটা পাখনাবিশিষ্ট (Winged) হয়ে থাকে। পত্রকক্ষে একটি করে ফুল আসে বা একাধিক ফুলের পুষ্পমঞ্জরী হয়। বৃতি পেয়ালাকার ও ৪-৫ ভাগে বিভক্ত, পাঁপড়ি ৪, ৫ বা ৮ হয়ে থাকে এবং পুরং। যতগুলো পাঁপড়ি তার থেকে চার থেকে দশগুণ পুংকেশর হয়। প্রতি গর্ভাশয়ে ৮ থেকে ১৮ টি প্রকোষ্ঠ থাকে। ফল বেরী জাতীয়। খোসা চামড়ার ন্যায়; খোসা

ও পাতায় তৈলগ্রন্থি বিদ্যমান। ফলের মধ্যে সেগমেন্ট বা কোয়া থাকে এবং কোয়ার মধ্যে রসাল থলে থাকে। বীজ কখনও কখনও বহুভ্র€ণী হয়ে থাকে।

চিত্র ৭.৫.১ঃ সীডলেস, কাগজী ও কাগজা লেবু

জাতসমূহ

লেবু- Lemons (*C. limon*) শ্রেণিরসীডলেস লেমন ঃ এটি বাণিজ্যিক জাত হিসেবে বহুল প্রচলিত। লেবু শ্রেণির মধ্যে বাংলাদেশে এটি প্রধান জাত। এর পাতার গড় সাইজ ৯.৮৮ থ .৯৬ সে. মি. এবং উইংলেস। গাছ দ্রুত বর্ধনশীল এবং মধ্যম কাঁটাযুক্ত। এর ফল বীজশ ন্য, আকারে লম্বা।

সীডলেস লেবু-২ ঃ এটির গড় ওজন ১৯৫.২০ গ্রাম, গাছ খুবই শক্তিশালী এবং প্রচুর ফল ধরে।

সীডলেস লেবু-৩ ঃ এটি কুমিল্লা এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এর গড় ওজন ২৯২.৬০ গ্রাম এবং সাইজ ১১.৭০ থ ৬.৯১ সে. মি., ত্বক ০.৫০ সে. মি. পুরু। তবে এগুলোর রস, এসিড এবং টিএসএস অনুমোদিত সীডলেস লেমনের মত।

এলাচী লেবু ঃ এটি দেশের উত্তর-প র্ব এবং প র্বাঞ্চলে পাওয়া যায়। এলাচীর ঘ্রাণ এজাতটির বৈশিষ্ট্য। ফলের আকার লম্বাটে বড় গড় ওজন ১৯৪.৬৭ গ্রাম, ত্বক অমসৃণ। গাছ কম কাঁটাযুক্ত এবং খুবই দ্র€ত বর্ধনশীল, পাতা বড়। ফলে অনেক বীজ আছে, ফল অত রসালো না।

চীনা লেবু ঃ এজাতটি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল এলাকায় প্রচুর জন্মে। দেখতে সীডলেস লেমনের মতই তবে এটি মাঝখানটায় বেশ মোটা। এর গাছ ওপরের দিকে বৃদ্ধি না হয়ে পাশেই প্রসারিত হয় বেশি। গাছে পাতা কম এবং কাঁটা বেশি। পাতার সাইজ ৮.৩০ থ ৪.৩২ সে. মি., ফলের সাইজ ৮.০৪ থ ৫.৭২ সে. মি. এবং ফলের গড় ওজন ১৩০.৩০ গ্রাম। ত্বক পুর€ শাঁসে রস কম (২৪.৬২%)।

এছাড়াও দেশে অনেক জাতের লেবু আছে। জারা এবং শাসনি লেবু সিলেট এবং মৌলভীবাজার জেলায় পাওয়া যায়। এগুলোর ত্বক শাঁসসহ মাংশের সাথে পাক করে খাওয়া হয়।

জামির শ্রেণির জাতসম হের মধ্যে কাগজী লেবু ও কাগজা লের প্রসিদ্ধ।

কাগজী লেবু ঃ (Citrus aurantifolia) এটি একটি বাণিজ্যিক জাত (চিত্র-৭.৫.১ দেখুন)। কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এর চাষ হয়। এর ফল গোলাকার ও ছোট।

কাগজা লেবু ঃ (Citrus aurantifolia) এটিও একটি বাণিজ্যিক জাত এবং দেশের উত্তর-প র্বাঞ্চল এর ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে (চিত্র-৭.৫.১ দেখুন)। এর ফল ডিম্বাকার কম থাকে। ত্বক মসৃণ ও পাতলা। ফল খুব রসাল।

উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র বারি বাতাবীলেবু-১ নামে একটি জাত মুক্তায়িত করেছে।

জাম্বুরা (*Citrus grandis*) ঃ লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে বাতাবী লেবুই আকারে সবচেয়ে বড় হয়। ফলের আকার ছোট, মাঝারী ও বড় হতে পারে। ফলের ত্বকের পর€ত্ব ১.০ সে. মি. থেকে ৯.০ সে. মি. পর্যন্ হতে পারে। ফল রসাল বা কম রসালও হতে পারে। যৌগিক ফল তিক্ত স্বাদ যুক্ত আবার কোসটি বেশ মিষ্টিও হয়। কোনো কোনো ফলের কোয়া গোলাপী আবার কোনটির সাদা কোয়া হয়। উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র বারি বাতাবী লেবু-১ নামে একটি জাত ১৯৯৭ সালে মুক্তায়িত করেছে।

কমলা (Mandarin) (*Citrus reticulata*) শ্রেণিভুক্ত ঃ বাংলাদেশের সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জন্মে। ফল পাকা অবস্থায় কমলা রং ধারণ করে। খোসা পাতলা ও সহজে চাড়ানো যায়। বীজ নাই অথবা ছোট ছোট অল্প পরিমাণে থাকে। কোষ সহজে ছাড়ানো যায়। ফল টক, টক মিষ্টি বা বেশ মিষ্টি হতে পারে। উলে-খ্য যে কমলা আন্ র্জাতিকভাবে গধহফধৎরহ নামে পরিচিত। যাহোক, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র সম্প্রতি বারি কমলা-১ নামে কমলার একটি জাত মুক্তায়িত করেছে (চিত্র-৭.৫.২ দেখুন)।

চিত্র ৭.৫.২ঃ বারি কমলা - ১

গাছের বংশ বৃদ্ধি

লেবুজাতীয় ফল সাধারণভাবে স্বপরাগায়িত। কিছু পরপরাগায়ন হয়ে থাকে।

সাইট্রাস বা লেবুজাতীয় ফল সাধারণভাবে স্বপরাগায়িত। এগুলোর বীজের গাছে তেমন তারতম্য হয় না। তবে বীজের গাছে ফল আসতে বেশি সময় নেয়। তাছাড়া কিছু পরপরাগায়ণও হয়ে থাকে। তাই বীজের গাছ লাগিয়ে ফলের গুণাগুণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। সেজন্য কলমের গাছ রোপণের সুপারিশ করা হয়। কারণ কলমের গাছে মাতৃগুণাগুণ সম্পূর্ণ বজায় থাকে। কলমের জন্য নির্বাচিত Root stock বা আদিজোড় ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের মাটিতে ফলের আবাদ করা যেতে পারে।

লেবু ও জামির এর গুটিকলমের সাহায্যে বংশ বিস্তার পদ্ধতি এদেশে বহুদিন থেকেই প্রচলিত। তবে এগুলোর Cuttings বা শাখা কলমের সাহায্যেও বংশ বিস্তার করা যায়। আবার নির্বাচিত Root stock এর সাথে ভিনিয়ার বা চোখকলমের (T-budding) সাহায্যে এগুলোর অঙ্গজ বংশ বৃদ্ধি বিশ্বের বহুদেশেই প্রচলিত। জাম্বুরার বংশ বৃদ্ধিও গুটিকলম বা ভিনিয়ার বা টি-বাডিং পদ্ধতিতে করার সুপারিশ করা হয়। উল্লেখ্য যে জাম্বুরাতে অন্যান্য লেবুজাতীয় ফলের চাইতে পরপরাগায়ণ বেশি হয়ে থাকে। তাই চারার গাছে মাতৃগুণাগুণ পাওয়া যায় না। সেজন্য এটির অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি খুবই প্রয়োজন।

কমলা গাছ ঃ বীজ থেকে করা যায়। সেক্ষেত্রে একাধিক বীজ গর্তে (Planting pit) ১ সে. মি. গভীরে রোপণ করা হয় এবং চারা গজানোর পর একটি রেখে বাদবাকী উপরে ফেলে দিতে হবে। বাংলাদেশে এখনও কোনো উপযোগী Root stock নির্বাচিত হয় নাই। তেমন Root stock পাওয়া গেলে কমলা টি-বাডিং পদ্ধতিতে কলম করে লাগানোই সবচেয়ে ভালো হবে।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু

বিশ্বের অবউষ্ণ অঞ্চলে, বিষুবরেখার ৪০° উত্তর এবং ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশের যে সমস্ত দেশে সুনির্দিষ্ট শীতকাল রয়েছে যা গাছকে সুপ্ত অবস্থায় যেতে সাহায্য করে সে সমস্ত দেশে লেবুজাতীয় ফলের চাষ সবচেয়ে ভালো হয়। বাংলাদেশের জলবায়ুতে কমলা, জাম্বুরা, লেবু, কাগজি লেবুও জন্মে। কাগজি ও কাগজা শুষ্ক অঞ্চলে যেমন- কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলে ভালো জন্মে। অথচ সীডলেস লেবু সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভালো জন্মে। অধিক বৃষ্টিপাত সম্পন্ন ঢালু জমিতে যেমন- বৃহত্তর সিলেট ও পার্বত্য চট্টগামে কমলা উৎপাদনের জন্য অধিক উপযোগী। জাম্বুরা উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ভালো জন্মে।

মাটি

বৃহত্তর সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ বালি এবং কংকরময়। ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি সহজেই নিকাশ হয়। কিন্তু দীর্ঘ শুষ্ক মৌসুমে সেচের প্রয়োজন। কিন্তু সুযোগের অভাব থাকায় সেচ দেয়া যায় না। তাই লেবু জাতীয় ফলগাছ (বিশেষ করে অগভীর শিকড় হওয়ায়) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে জমির ক্ষয় হয় এবং গাছের পুষ্টি উপাদান মাটি থেকে চলে যায়। ফল গাছে নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম এবং জিংক এর অভাব দেখা দেয়। এসব জমির পিএইচ ৪.৫ থেকে ৫.৫। কিন্তু লেবুজাতীয় ফল গাছের জন্য পিএইচ ৫.০ থেকে ৬.০ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চাষাবাদ প্রণালি

রোপণের দ রত্ব ও রোপণের সময় ঃ লেবু ও কাগজী লেবু ৪ × ৪ মিটার দ রত্বে রোপণ করা যায়। কিন্তু কমলা ও জাম্বুরা ৬ × ৬ মিটার দ রত্বে রোপণ করাই শ্রেয়। বর্ষা মৌসুমের শুর€তে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাসে রোপণ করাই উত্তম। তবে সেচ সুবিধা থাকলে ভাদ্র-আশ্বিন (সেপ্টম্বর-অক্টোবর) এ গাছ রোপণ করা যেতে পারে। এসময় শুষ্ক মৌসুম শুর€ হয়ে যায়। তাই গাছ লেগে না ওঠা পর্যন্ অতিরিক্ত পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। ৩ × ৩ মিটার দ রত্বে রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ১১০০ গাছের প্রয়োজন হয় এবং ৬ × ৬ মিটার দ রত্বে রোপণ করলে হেক্টর প্রতি প্রায় ২৭৫ টি গাছের প্রয়োজন হয়।

জমি চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করে নেয়া উচিত।

জমি তৈরি, চারা রোপণ ও সার প্রয়োগ ঃ জমি চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হবে। এর পর দ রত্ব অনুযায়ী মাপজোক করে কাঠি পুঁতে রোপণের স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। তারপর কাঠিটিকে কেন্দ্র করে ৫০ সে. মি. গভীর করে ৫০ থ ৫০ সে. মি. সাইজের গর্ত খুঁড়তে হবে। চারা বা কলমের গাছ রোপণের ১০-১৫ দিন আগে গর্ত প্রতি ১৫-২০ কেজি গোবরসার বা আর্বজনা পঁচাসার মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ফেলতে হবে। গর্তভরাট করার পর এর উপরের ২০-২৫ সে. মি. মাটির সাথে ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার হালকা কোপ দিয়ে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে। এরপর গর্তে গাছ রোপণ করা যেতে পারে। এক বছরের চারা বা কলমের গাছ রোপণ করাই সবচেয়ে ভালো। রোপণের পরপরই গাছ যাতে বাতাসে না পড়ে যায় সেজন্য পাশে একটি বা দু'টি কাঠি পুঁতে সুতলী দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। রোপণের পরপরই গাছে সেচ দিতে হবে এবং গাছ যতদিন লেগে না ওঠে ততদিন বৃষ্টি না থাকলে ২-৪ দিন পরপর সেচ দিতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ গাছে যে পরিমাণ সার দিতে হবে তা সারণি ২ এ দেখানো হলো।

সারণি ২ ঃ বিভিন্ন বয়সের লেবুজাতীয় ফল গাছে সারের পরিমাণ।

সার	১-২ বছর বয়স	৩-৫ বছর বয়স	৬ বছর ও তদুর্দ্ধ বয়স
গোবর বা আর্বজনা পঁচাসার (কেজি)	১৫	২০	২৫-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০	৪০০	৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০
এমপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০

বর্ষা মৌসুমের শুর€তে জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে সম্ž র্ণ গোবর সার একবারে প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য সার তিন কিস্তি তে উপরি প্রয়োগ পদ্ধতিতে (Topdressing) আশ্বিন (সেপ্টেম্বর), মাঘ (ফেব্র€য়ারি) এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে প্রয়োগ করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে গোবর সার গাছের চারদিকের মাটির সাথে কোদাল দিয়ে ভালোভাবে মিশে দিতে হবে। এরপর আগাছা বা আর্বজনা দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে যাতে বৃষ্টি হলে ধুয়ে না যায়। অন্যান্য সার Dibling পদ্ধতিতে দিলেই চলবে।

পরিচর্যা

একটি দেখতে সুন্দর এবং শক্ত কাঠামোর গাছ তৈরি করার জন্য অঙ্গছাঁটাই এর প্রয়োজন হয়।

ট্রেনিং ও প্র€নিং বা অঙ্গছাটাই ঃ ছোট গাছে সঠিকভাবে বাড়তে দেয়ার জন্য সে সব অবাঞ্চিত শাখা-প্রশাখা বের হয় সেগুলো ছাঁটাই করে দিতে হয়। এভাবে একটি দেখতে সুন্দর এবং শক্ত কাঠামোর গাছ তৈরি করা যায়। এর ফলে গাছের মধ্যে প্রচুর আলোবাতাস ও স র্যালোক প্রবেশ করতে পারে। ফলে গাছে রোগবালাই এবং পোকামাকড় আক্রমণ কম হয়। তাছাড়া সব বয়সের গাছেই বর্ষার পর ও

বর্ষা শুর€র আগে বিশেষ করে ফল আহরণের পরপরই যত মরা ডালপালা, রোগাক্রান্ ডালপালা, অনেক শাখা-প্রশাখা একটির সাথে আর একটি বেঁধে গেছে সেগুলো অথবা ডধঃবৎ ংঢ়ৎড়ঁঃং অবশ্যই ছাঁটাই করে দিতে হবে।

ফল ছাঁটাই ঃ গাছে অতিরিক্ত ফল আসলে এগুলোর কিছুটা ছাঁটাই করে দেয়াই ভালো। এতে ফল বড় হয়, গাছ নিয়মিত ফল দেয় এবং দীর্ঘজীবী হয়।

সেচ ঃ শীতের পরেই গাছে ফুল আসে। ফুল আসা থেকে বর্ষা শুর€ হওয়ার প র্ব পর্যন্ প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। তাহলে ফল বড় হয় এবং ফলের গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। গাছের বৃদ্ধিও অব্যাহত থাকে।

তাছাড়া বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে সেচ দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশণের সুব্যবস্থা করতে হবে এবং শুষ্ক মৌসুমে গাছের গোড়া খড়, শুকনা আগাছা বা কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

লেবুজাতীয় ফল গাছের উরব-back, Gummosis ৷ Greening মারাত্মক রোগ।

রোগ দমন ঃ লেবুজাতীয় ফল গাছের Die-back অর্থাৎ পাতা এবং শাখা-প্রশাখার শীর্ষভাগ মরে যাওয়া একটি মারাত্মক রোগ। এরোগ দেখা দিলে মরা ডালপাতা ছেঁটে দিয়ে ১০-১২ দিন পরপর বোরদো মিকচার বা কোনো কপার ছত্রাক নাশক স্প্রে করলে এরোগ দমন করা যায়। এছাড়া Gummosis হলে বাকল ফেটে রস পড়তে থাকে। আক্রান্ত অংশ চেঁচে ফেলে এখানে ছত্রাকনাশক পেষ্ট লাগাতে হবে। তাছাড়া ছায়া প্রদানকারী গাছ রোপণ এবং এ রোগ প্রতিরোধকারী র€টষ্টক ব্যবহার করা যেতে পারে। Greening একটি মারাত্মক রোগ যা Mycoplasma এর আক্রমণে হয়ে থাকে। এরোগ এক প্রকারের Psyllid insect vector (*Diaphorina citri*) দ্বারা এক গাছ থেকে আর এক গাছে বিস্ ার লাভ করে। এটির কোনো দমন পদ্ধতি জানা নাই। তবে পোকা দমন করে এর বিস্ ার রোধ করা যেতে পারে।

পোকামাকড় দমন ঃ Citrus Leaf Miner লেবুজাতীয় গাছের একটি মারাত্মক পোকা। বাŽচা অবস্থায় নতুন পাতায় আক্রমণ করে। নতুন পাতা বের হওয়ার সাথে সাথে dimethoate (Rogor/Roxion/Perfecthion) ৪০ উঈ প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মি. লি. ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। প্রথম স্প্রের ১৫ দিন পর আবার স্প্রে করতে হবে। তা'হলে এপোকা দমন হবে। Citrus psylla (*Diaphorina citri*) খুবই মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা। দেখা দেয়া মাত্র Citrus Leaf Miner দমনের কথা ওপরে যেভাবে বলা হয়েছে একইভাবে এ পোকাও দমন করা যেতে পারে।

Fruit Sucking Moth মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা। এর আক্রমনে ফল পঁচে ঝরে যায়। বাগান পরিŽছন্ন রাখা এবং বিষাক্ত টোপ (Poison bait) ব্যবহার করে এর সংখ্যা কমানো যেতে পারে। তাছাড়া Light trap ব্যবহার করেও এর সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

ফল আহরণ ঃ লেবু ও জামির মাঘ-ফাল্গুনে (ফেব্র€য়ারি) ফুল আসে এবং আষাঢ়-শ্রাবন (জুলাই-আগষ্ট) মাসে এগুলো আহরণ করা হয়। জাম্বুরাতে মাঘ-ফাল্গুনে (ফেব্র€য়ারি) ফুল আসে এবং ভাদ্র-আশ্বিনে ফল আহরণ করা যায়। কমলার ফুল মাঘ-ফাল্গুনে এবং ফল আহরণ করতে হয় আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণ (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) মাসে।

ফলন

লেবু	ঃ	১০০ - ১০০০ টি ফল প্রতি গাছে
জাম্বুরা	ঃ	১০০ - ৩০০ টি ফল প্রতি গাছে
কমলা	ঃ	১০০ - ৫০০ টি ফল প্রতি গাছে

অনুশীলন (Activity) *ঃ লেবু জাতীয় ফলের যে সকল প্রজাতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ হয়ে থাকে সেগুলোকে মোট কয়টি উদ্যানতাত্ত্বিক শ্রেণিতে ভাগ করা যায় এবং এদের নামগুলো বৈজ্ঞানিক নামসহ লিখুন। উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র লেবুজাতীয় ফলের কী কী জাত মুক্তায়িত করেছেন তা লিখুন।*

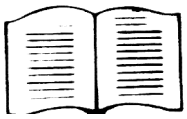

সারমর্মঃ দক্ষিণ-প র্ব এশিয়ার উষ্ণ ও অবউষ্ণ অঞ্চলের দেশসম হ অধিকাংশ লেবুজাতীয় ফলের উৎপত্তিস্থল। Rangpur lime, Indian sweet lime, Rongh lemon ইত্যাদির আদি উৎপত্তিস্থল হঁেছ আসাম ও বাংলাদেশ। লেবুজাতীয় ফল খাদ্যপ্রাণ সি সমৃদ্ধ। Citrus গণের অধীনে যে সকল প্রজাতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ হচ্ছে; সেগুলোকে মোট চারটি উদ্যানতত্ত্বাতিক শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে যেমন (১) Sweet orange (মাল্টা) (২) Mandarih (কমলা) (৩) Lime & lemon (জামির ও লেবু)

(৪) Pummelo & grape fruits (জাম্বুরা এবং ঝুমকা জাম্বুরা)। খবসড়হ বা লেবুর জাতসম হের মধ্যে সীডলেস লেমন, সীডলেস লেবু-২ ও সীডলেস লেবু-৩ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। খরসব বা জামির শ্রেণির বিভিন্ন জাতের মধ্যে কাগজী ও কাগজা জাত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ হয়। উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র বারি বাতাবীলেবু-১ নামে জাম্বুরার একটি জাত এবং বারি কমলা-১ নামে কমলার একটি জাত মুক্তায়িত করেছে। লেবুজাতীয় ফল সাধারণভাবে স্বপরাগায়িত তবে কিছু পরপরাগায়ণ হয়। এদেশে

লেবু জাতীয় ফলের বংশ বিস্ ার গুটিকলমের সাহায্যে বহুদিন থেকেই করা হয়। অঙ্গঁছাটাই এর মাধ্যমে দেখতে সুন্দর এবং শক্ত কাঠামোর একটি গাছ তৈরি করা যায়। লেবুজাতীয় ফলের কতিপয় মারাত্মক রোগ ও পোকা আছে; যেগুলো দমন না করলে ফলন খুবই কমে যায়। লেবু ও জামির আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এবং জাম্বুরা ভাদ্র-আশ্বিনে ফল আহরণ করা হয়। গাছের বয়স ও বৃদ্ধির ওপর ফলের সংখ্যা নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৫

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) বাংলাদেশ হচ্ছে লেবু জাতীয় ফল বিশেষ করে লেবু ও জামিরের উৎপত্তিস্থল।

খ) স্বপরাগায়নের মাধ্যমে ফুলের পরাগায়ন হয়ে থাকে না।

গ) অধিক বৃষ্টিপাত সম্বলিত ঢালু জমি কমলা উৎপাদনের জন্য উপযোগী নয়।

ঘ) কমলার ফুল আসে মাঘ-ফাল্গুনে এবং ফল আহরণ করতে হয় আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ন মাসে।

ঙ) গাছের বয়স ও বৃদ্ধির ওপর ফলের সংখ্যা নির্ভর করে।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মালয়েশিয়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইন্ডিয়ার উত্তর-প র্বাঞ্চলে ও বাংলাদেশকে ..... এবং ..... এর উৎপত্তিস্থল বলে মনে করা হয়।

খ) লেবুজাতীয় সব ফল খাদ্যপ্রাণ ..... সমৃদ্ধ।

গ) লেবুর ফল ..... জাতীয়।

ঘ) উলে-খ্য যে কমলা আন্তর্জাতিকভাবে .....নামে পরিচিত।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) সহজে খোসা ছাড়ানো যায় এমন কমলা লেবুর ইংরেজী নাম কোন্‌টি?

ক) সুইট অরেঞ্জ

খ) ম্যান্ডারিন অরেঞ্জ

গ) সাওয়ার অরেঞ্জ

ঘ) পমেলো

ii) চীনা লেবু কোথায় পাওয়া যায়?

ক) কুমিল-া

খ) শ্রীমঙ্গলে

গ) চীন দেশে

গ) রাজশাহীতে

পাঠ ৭.৬ নারিকেল

এ পাঠ শেষে আপনি –

- নারিকেলের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- নারিকেলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার সম্পূর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- নারিকেলের জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- নারিকেলের চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার

উৎপত্তিস্থল

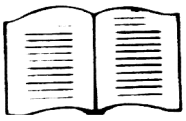

দক্ষিণ-প র্ব এশিয়ার উষ্ণ মন্ডলীর দেশসমূহে ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর কোনো এক জায়গায় নারিকেলের আদি উৎপত্তিস্থল। মালয়েশিয়া অথবা ইন্দোনেশিয়ার এর উৎপত্তিস্থল হতে পারে। তারপর সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে নারিকেল প্রশান্ ও ভারত মহাসাগরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।

উৎপাদন

বর্তমানে নারিকেল উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলো হচ্ছে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, ইন্ডিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, ফিজি, সলোমন আইল্যান্ড, সামোয়া ও মেক্সিকো। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩০,৬০০ হেক্টর জমিতে নারকেলের চাষ হয় এবং ৭৫,৯০০ টন নারিকেল উৎপন্ন হয়।

ব্যবহার

ডাবে পুষ্টি ও বলদানকারী বিশুদ্ধ সুপেয় পানি রয়েছে।

নারিকেল এদেশের জনগণের একটি প্রিয় অর্থকরী ও লাভজনক ফসল। আবাদী নারিকেল বা ডাবের পানি পুষ্টি ও বলদানকারী বিশুদ্ধ সুপেয় পানি। অসুস্থ জনের পথ্য হিসেবে এবং খরায় আপামর জনসাধারণের তেষ্টা মেটাতে এর জুড়ি নাই। ডাবের নরম শাঁস ও ঝুনা নারকেলের শাঁস এবং এদ্বারা তৈরি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী সবারই পছন্দ। চুল বিন্যাসে নারিকেল তৈল অতুলনীয়। নারিকেল তৈল সাবান, শ্যাম্ু, ও নানাপ্রকার প্রসাধনী সামগ্রী তৈরির প্রধান উপকরণ। নারিকেলের ওপর ভিত্তি করে দেশে কোপরা (নারিকেলের শুকনো শাঁস), নারিকেল তৈল, কার্পেট, রশি, বোতাম প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠেছে। তাছাড়া ঝড় ও সামুদ্রিক জলেচ্ছ্বাসে অন্যগাছের তুলনায় নারিকেল বেশি টিকে থাকতে পারে এবং বিপদে আপদে মানুষের বেশি উপকারে লাগে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

নারিকেল Palms (Palmae) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Cocos nucifera* L. এটি একটি বহুবর্ষজীবী, একবীজ পত্রী, এককান্ডবিশিষ্ট গুচ্ছম ল উদ্ভিদ। কোনো কোনো জাতের নারিকেলের কান্ডের ব্যাসার্ধ মাত্র ২০০ এমএম এবং কান্ড গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ সমান (বামন জাতসম হ)। আবার অনেকজাত আছে যেগুলোর কান্ডের ব্যাসার্ধ ৩৫০ এমএম; সেগুলোর বোলের বা গোড়ার ব্যাসার্ধ ৮০০ এমএম বা তার বেশি হতে পারে। Tall group ও Dwarf group- এ দু'টি গ্রুপ কৌলিতত্ত্বের দিক থেকে স্পষ্টতঃ পৃথক। কান্ডের দৈর্ঘ্য ১২-২৪ মিটার হতে পারে। একটি সতেজ প র্ণ বয়স্ক গাছে ৩৫-৩৬ টি পাতা থাকে পাতার বোঁটা খুব মজবুত এবং ৯০-১৫০ সে. মি. লম্বা হয়। পাতা

লম্বায় ৪-৬ মিটার হতে পারে। প্রতিটি পাতায় অনেক অনুপত্র মজবুত শিরার দু-পাশে সমদ রত্বে অবস্থান করে। অনুপত্রগুলো সর€, ৬০-৯০ সে. মি. লম্বা এবং অগ্রভাগ চিকন। গাছের শীর্ষে মুকুট আকারে সাজানো পল-বকে 'ক্যাবেজ' বলে।

পুষ্পমঞ্জরীতে স্ত্রী ও পুর€ষফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয় (গড়-হডবপরডঁং)।

পুষ্পমঞ্জরী Spadix ধরনের এবং সাধারণত ১.২-১.৮ মি. লম্বা হয়। পুষ্পমঞ্জরীতে স্ত্রী ও পুর€ষফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয় (Monoecious)। প্রতিটি পুষ্পমঞ্জরীর শাখাগুলোর (Spikes) গোড়ার দিকে এক বা একাধিক স্ত্রীফুল এবং অগ্রভাগে অনেক পুর€ষফুল থাকে। পুর€ষ ও স্ত্রীফুলের অনুপাত ২০০-৩০০ ঃ ১-৫। স্ত্রীফুল পুর€ষফুল অপেক্ষা বড় হয় এবং স্ত্রীফুলগুলোকে Button বলা হয়। পুষ্পমঞ্জরী দুটি আবরণী (Spathes) দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতি পুষ্পমঞ্জরীতে ৩০-৪০টি ফল ধরে।

চিত্র ৭.৬.১ টিপিকজাতের নারিকেল

জাতসমূহ

নারিকেলের জাত প্রধানত তিনটি- (১) টিপিকা জাত (Typica variety), যা লম্বা শ্রেণিভুক্ত; (২) জাভানিকা জাত (Javanica variety), মাঝারী লম্বা শ্রেণির এবং (৩) নানা জাত (Nana variety) যা বামন (Dwarf) শ্রেণির।

আমাদের দেশে বলতে গেলে সব নারিকেল গাছই টিপিকা শ্রেণির বা জাতের (Tall)।

টিপিকা জাত (Tall)ঃ এ জাতের গাছ লম্বা, কান্ড মোটা এবং কান্ডের গোড়া স্ফীত বা বোল (Bole) বিশিষ্ট হয়। এ জাতের গাছ ৬-৭ বছর বয়সে ফল ধরা আরম্ভ করে, ২০-২২ মিটার উচুঁ হয় এবং ৬০-৭০ বছর পর্যন্ত ফল দিয়ে থাকে। এ জাতের গাছ সাধারণভাবে পরপরাগায়িত (Crosspollinated)। বাংলাদেশের সব নারিকেল গাছ এ জাতে অন্তর্ভুক্ত। এ জাতের মধ্যে বহু উচ্চ ফলনশীল উপজাত আছে যেগুলো বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক নারিকেল হিসেবে আবাদ হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও টিপিকা জাতটির মধ্যেও ডাবের গায়ের রং কোনটির সবুজ, কোনটির বাদামি আবার কোনটির সবুজাভ সাদা দেখা যায়। এগুলোকেই টিপিকা বা লম্বা শ্রেণির বিভিন্ন জাত হিসেবে গন্য করা হয়। আমাদের দেশে

বলতে গেলে সব নারিকেল গাছই টিপিকা শ্রেণির বা জাতের। শাঁসের জন্য এ জাতটিই সবচেয়ে ভালো। (চিত্র-৭.৬.১ দেখুন)।

জাভানিকা জাতঃ এটি Semi-dwarf শ্রেণির অন্ ভুর্ক্ত। এর কান্ড মাঝারী মোটা হয় এবং গোড়ায় 'বোল' হয় না। এ জাতের গাছ স্বপরাগায়িত। এ শ্রেণির গাছ ৪-৫ বছর বয়সেই ফল দেয়া শুর€ করে এবং ৫০-৬০ বছর পর্যন্ ফল হয়। ষাটের দশকে এগুলো এদেশে আমদানি করা হয়েছে। এ জাতটি পানি ও শাঁস উভয়টির জন্যই মোটামুটি ভালো।

বামন জাতের গাছের গোড়ায় কোন 'বোল' নাই। এজাতের গাছ স্বনিষেকী।

বামন জাত (Dwarf/Nana Variety) ঃ এ শ্রেণির গাছ খাটো কান্ড বিশিষ্ট। গাছের গোড়ায় কোনো 'বোল' নাই। এজাতের গাছ স্বনিষেকী। ফল ছোট আকারের। ২৫০ থেকে ৮০০ গ্রামের বেশি হয় না। ৩-৪ বছর বয়সেই ফল ধরা শুর€ করে। এ শ্রেণির গাছে ৩০-৪০ বছর পর্যন্ ফল দেয়। কোকোনিনো নামে এর এক জাত প্রতি ছড়ায় ৩০-৪০ টি নারিকেল এবং প্রতিগাছে সব সময়ই ৩০০ টির মত নারিকেল থাকে। ষাটের দশকে এজাতটি মালয়েশিয়া থেকে এদেশে প্রবর্তন করা হয়েছে। এটি ডাব হিসেবে খাওয়ার জন্য ভালো। এজাতটি শাঁস উৎপাদনের জন্য বা তেলের জন্য মোটেই ভালো নয়।

টিপিকা জাত অর্থাৎ লম্বাজাতটি যথাযথ সার, সেচ ও পরিচর্যা পেলে রোপণের সাড়ে তিন বছর থেকে পাঁচ বছর পরেই ফল দেয়া শুর€ করে।

ফুল আসা, ফল ধারণ ও উৎপাদন ঃ টিপিকা জাত অর্থাৎ লম্বাজাতটি যথাযথ সার, সেচ ও পরিচর্যা পেলে রোপণের সাড়ে তিন বছর থেকে পাঁচ বছর পরেই ফল দেয়া শুর€ করে। প্রথম ফুল আসার তিন থেকে পাঁচ বছর পরে গাছ পুরোপুরি ফল দেয়া শুর€ করে। বামন জাতগুলো (Javanica and Nana Palms) যদি ভালো পরিচর্যা পায় তবে রোপণের ২১ মাস পরেই ফুল দেয়া শুর€ করে। এর দু'তিন বছর পর থেকে পুরোপুরি ফল দেয়া শুর€ করে। একটি পুষ্পমঞ্জরীতে দুই থেকে তিন ডজন স্ত্রীফুল থাকে এবং সহস্রাধিক পুর€ষফুল থাকে। প্রত্যেকটি পুর€ষফুলে হাজার পর্যন্ রেণু থাকে। পরাগায়ণের পরই স্ত্রীফুল ফলে পরিণত হয়। পরাগায়ণের পরও বহু স্ত্রীফুল পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণে বাতাস অথবা পানির অভাবে অথবা বৈরী পরিবেশের জন্য ঝরে যায়। সাধারণত এক একটি পুষ্পমঞ্জরী পরাগায়ণের ১০-১১ মাস পর ৬ থেকে ১৮ টি নারিকেল ধারণ করে। ১২ মাসে নারিকেল সম্পূর্ণ বাত্তি হয় অর্থাৎ ঝুনো নারিকেলে পরিণত হয়। একটি সুস্থ গাছে অনুকূল পরিবেশে বছরের যে কোনো সময় বিভিন্ন বয়সের ১৪টি নারিকেলের বাদা (Bunch) দেখতে পাওয়া যায়।

বংশ বিস্তার

নারিকেল গাছের বংশবৃদ্ধির জন্য প্রথম কাজ হবে মাতৃগাছ নির্বাচন।

নারিকেল গাছের বংশ বৃদ্ধি বীজ দ্বারাই হয়ে থাকে। নারিকেল গাছের বংশবৃদ্ধির জন্য প্রথম কাজ হবে মাতৃগাছ নির্বাচন। এদেশে মে-জুন মাসে টিপিকা জাতের নারিকেল গাছে অল্প দিনের ব্যবধানে একাধিক পুষ্পমঞ্জরী বের হয়। সুতরাং টিপিকা (লম্বা জাতের) জাতের গাছেও স্বপরাগায়ণ হওয়া সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেহেতু ছড়া বের হওয়ার পর নারিকেল ঝুনা হতে ১২ মাস সময় নেয় তাই মে-জুন মাসে আহরিত ঝুনা নারকিলে মাতৃগুণাগুণ বজায় রাখার সম্ভাবনা অধিক। বীজমাতা নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া উচিত।

(১) ফলন ঃ গাছের সবচেয়ে বড়গুণ হবে অধিক ফলন। পুর€ শাঁস বিশিষ্ট মাঝারী হতে বড় সাইজের ৬০ থেকে ১০০ টি নারিকেল বছরে ধরে এমন গাছ মাতৃগাছ হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।

(২) গাছের মাথা ঃ যে সব গাছের মাথা সব সময়ে পাতা ও বিভিন্ন বয়সের ফলে ভরা থাকে এমন গাছ মাতৃগাছ হিসেবে উত্তম।

(৩) কান্ড ও পাতা ঃ কান্ড সুষম ও মাঝারী লম্বা এবং পাতার বিন্যাস যত ঘন হবে ততই উত্তম। পাতার বোঁটা খাটো ও প্রশস্ত হতে হবে।

(৪) পোকা ও রোগবালাই থেকে মুক্ত ঃ নির্বাচিত মাতৃগাছগুলোর মাথায় স্বাভাবিকভাবে অবস্থিত ঝুনা নারিকেল সতর্কতার সাথে পেড়ে বীজ নারিকেল বাছাই করতে হবে। বীজ নারিকেল গাছে খুব শুকানো দেয়া ঠিক নয়। বাদামি রং ধরার পর পরেই বীজ-নারিকেল সংগ্রহ করা উচিত। বীজ-নারকিলের ওজন ও সাকার স্বাভাবিক হতে হবে। ওজনে হালকা, বোঁটার দিকে পুর€ ও ছোবড়া বিশিষ্ট নারিকেল বীজের উপযুক্ত নয়। তাছাড়া বীজ নারিকেল পোকামাকড় ও রোগবালাই মুক্ত হতে হবে।

বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

প্রথমে বীজতলায় বীজ নারিকেল রোপণ করে চারা উৎপাদন করতে হয়। বীজতলার জন্য পানি নিষ্কাষনের সুবিধাযুক্ত এমন উঁচুজমি নিতে হবে যেখানে বন্যার পানি ঢোকে না এবং বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না। আবার সেচের সুবিধার জন্য নিকটবর্তী পানির উৎস থাকা চাই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজতলা তৈরি এবং বীজ নারিকেল রোপণের উপযুক্ত সময়। উন্মুক্ত জায়গায় বীজতলা হতে হবে। গাছের নিচে বীজতলা করা উচিত নয়। কাজের সুবিধার জন্য প্রতিটি বীজতলা ১ থ ৬ মিটার সাইজের করা ভালো। প্রতিটি বীজতলা মাটির সমতল থেকে ২০ থেকে ২৫ সে. মি. উঁচু হওয়া চাই। পাশাপাশি দু'টি বীজতলার মাঝখানে ৫০ সে. মি. প্রশস্ত পানিসেচ ও নিষ্কাশনের জন্য নালা থাকবে।

প্রতি বীজতলায় লম্বালম্বি ২০ সে. মি. দ রত্বে ২০ সে. মি. প্রশস্ত ও ১৫ সে. মি. গভীর করে পাশাপাশি দু'টি নালা কেটে নিতে হবে। এ নালাতে ২০ সে. মি. দ রত্বে বীজ নারিকেলগুলো মাটির সমান্তরালে বসাতে হবে। নারিকেলের যে দিকটা বেশি প্রশস্ত সেদিক নিচের দিকে অর্থাৎ মাটির সাথে লাগান থাকবে। তাছাড়া নারিকেলে যে দিকে চোখ থাকে সেদিকটা পেছনের চেয়ে ৫ সে. মি. উঁচু থাকবে। একসারি থেকে অন্যসারিতে বীজ নারিকেল বসানোর সময় মুখগুলো বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে বসাতে হবে। এরপর মাটি দিয়ে বীজ নারিকেলগুলো এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে শুধু নারিকেলের ওপর অংশটুকু সামান্য দেখা যায়। মাঝে মাঝে সেচ দিতে হবে এবং সেচ দিলে যাতে মাটি সরে না যায় এবং পানি সংরক্ষণ ও আগাছা দমনের জন্য বীজতলা খড়, কচুরিপানা বা নারিকেল পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পোকা আক্রমনের সম্ভাবনা থাকলে বীজতলা খড় বা নারিকেল পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়ার আগে প্রয়োজনীয় কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। উন্মুক্ত স র্যালোক এবং মাটিতে সর্বদা রস সংরক্ষণ করা সফল চারা উৎপাদনের জন্য অত্যাবশক। যথাযথ পরিচর্যায় রোপণের দুই থেকে চারি মাসের মধ্যেই চারা গজিয়ে যায়। সঠিক পরিচর্যা আর অনুকূল পরিবেশ পেলে গজানোর ছ'মাসের মধ্যেই চারাগুলো তিনটি পাতাসহ এক মিটার উঁচু হয়ে উঠবে। এখন চারাগুলো স্থায়ী জায়গায় রোপণের উপযুক্ত হয়েছে।

চারা স্থানান্তরকরণ

চারা উঠানোর আগে সেচ দিয়ে নেয়া ভালো। চারার ডগা বা বোঁটা ধরিয়া কখনও টানা উচিত নয়।

বেশ সাবধানতার সাথে চারা উঠাতে হবে। চারা উঠানোর আগে সেচ দিয়ে নেয়া ভালো। চারার ডগা বা বোঁটা ধরিয়া কখনও টানা উচিত নয়। চারার পাশে একটু খুঁড়ে বীজ নারিকেলের নিচে কোদাল

দিয়ে একটু চাপ দিয়ে আলগা করে তারপর দুই হাত বীজ নারিকেলের তলায় এবং পাশে দিয়ে চারা তুলতে হবে। চারা কখনও হাতে নেয়া উচিত নয়। বীজতলা থেকে চারা উঠানোর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চারাগুলো যথাস্থানে রোপণ করতে হবে। দেরী হলে চারাগুলো দুর্বল হয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র সুস্থ, দ্র€ত বর্ধনশীল, শক্তিশালী গাঢ় সবুজপাতা বিশিষ্ট চারা রোপণের জন্য নির্বাচন ও বিতরণ করতে হবে।

চারা রোপণের রত্ব ও সময়

বিভিন্ন জাতের চারা বিভিন্ন দ রত্বে রোপণ করতে হয়। বর্গাকারে বা ত্রিভুজাকারে রোপণ করা যেতে পারে। তবে আন্ ঃফসল চাষের সুবিধার জন্য বর্গাকারে রোপণ করা ভালো। বাগানে চারা যে দূরত্বে রোপণ করা হয় আবার বাড়ির আশে পাশে এক সারিতে কম দূরত্বে রোপণ করা চলে। যাহোক বিভিন্ন জাতের চারা রোপণের দূরত্ব সারণি- ২ এ দেয়া হলো।

সারণি ২ ঃ নারিকেলের বিভিন্ন জাতের চারা রোপণের দ রত্ব

জাত	বাগানে রোপণের দ রত্ব (মি.)	হেক্টর প্রতি গাছের সংখ্যা (বর্গাকারে)	বাড়ির আশে পাশে একসারিতে গাছ রোপনের দ রত্ব (মি.)	হেক্টর প্রতি গাছের সংখ্যা (বর্গাকারে)
টিপিকা জাত (লম্বা শ্রেণি)	৮.৫	১৩৮	৬.০	২৭৭
জাভানিকা জাত (মাঝারি লম্বা শ্রেণি)	৭.৫	১৭৭	৫.০	৪০০
নানা জাত (বামন শ্রেণি)	৬.৫	২৩৬	৪.৫	৪৯৪

রোপণের সময় ঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসেই নারিকেল চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে সেচ ও পরিচর্যার সুযোগ থাকলে ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও চারা রোপণ করা যেতে পারে।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু

নারিকেল উষ্ণ মন্ডলীয় ফসল। এফসল উভয় গোলার্ধের ২৭° অক্ষাংশ পর্যন্ত জন্মে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত এর ব্যাপক চাষ হয়। ১৩০০ থেকে ২৩০০ মি. মি. বার্ষিক বৃষ্টিপাত নারিকেল উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে ভালো এবং বৃষ্টিপাত ১০০০ মি. মি. এর কম হলে নারিকেল উৎপাদন বেশি কষ্টকর। নারিকেল উৎপাদনের প্রধান অঞ্চলসমূহের তাপমাত্রা ২০ থেকে ৩২° সেলসিয়াস। খুব বেশি

তাপমাত্রায় পরাগায়ণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। নারিকেল উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া পছন্দ করে। নারিকেল চাষের জন্য চাই প্রচুর স র্যালোক।

মাটি

নারিকেল সব রকমের মাটিতেই জন্মে। তবে নারিকেল বাগানের মাটি পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়া চাই। ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা এবং ফিলিপাইনের পলিমাটিতে সবচেয়ে ভালো নারিকেল জন্মে। যে সমস্ত অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুম বিরাজমান যেমন বাংলাদেশ; সেখানে পানির স্তর মাটির এক থেকে আড়াই মিটারের মধ্যে থাকলে ভালো হয়। মাটির পিএইচ ৫.২ থেকে ৮.০ এর মধ্যে নারিকেল ভালো জন্মে। দীর্ঘ জলাবদ্ধতা নারিকেল গাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নয়।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি তৈরি

জমি বেশ কয়েকবার চাষ দিয়ে ভালো করে তৈরি করতে হবে। সারি থেকে সারির দ রত্ব এবং সারিতে গাছের দ রত্ব মাপজোক করে রোপণের স্থান কাঠি পুঁতে নির্দিষ্ট করতে হবে। তারপর কাঠিটিকে কেন্দ্র করে এক মিটার গভীর করে ১.০ থ ১.০ মিটার সাইজের গর্ত খুঁড়তে হবে। এ সময় গর্তের উপরের স রের মাটি আলাদা রাখতে হয়। গাছ রোপণের ১০-১৫ দিন আগেই গর্তগুলো সার মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। চারা ভূমি সমতলে রোপণ না করে ৩০ সে. মি. গর্তের গভীরে রোপণ করা অনেক দিক দিয়েই উপকারী।

সার প্রয়োগ

গর্তের উপরের মাটির সাথে গর্তপ্রতি ২০ কেজি গোবর মিশিয়ে গর্তগুলো ৩০ সে. মি. বাকি রেখে ভরাট করতে হবে। তারপর প্রতি গর্তের ২৫ সে. মি. মাটির সাথে নিম্নবর্ণিত সারগুলো অর্ধেক মিশাতে হবে।

সারের পরিমাণ

গোবর	ঃ ২০ কেজি	এমপি	ঃ ১৬৬০ গ্রাম
ইউরিয়া	ঃ ১৩২৫ গ্রাম	জিপসাম	ঃ ২৭৭৫ গ্রাম
টিএসপি	ঃ ১০৪০ গ্রাম	জিংক সালফেট	ঃ ২৭৫ গ্রাম

বাকি সারগুলো ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাছের চারদিকে ৩-৫ মিটার পর্যন্ ছিটিয়ে টিলার বা লাঙ্গল দিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে।

চারা রোপণ

সার মিশানো মাটি দিয়ে গর্তগুলো ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর নারিকেলের সুস্থ, সবল চারা গর্তের মাঝখানে বসাতে হবে। চারা গর্তের মাটিতে রোপণের সময় চারা নারিকেলটি শুধু মাটি চাপা দিতে হবে এবং চারদিকের মাটি শক্ত করে বসিয়ে দিতে হবে। রোপণের বয়স চারার সময় ৯-১২ মাস হওয়া উত্তম। অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় যখন মাটি কর্দমাক্ত থাকে তখন সার মিশানো বা চারা রোপণ না করে যখন জমিতে 'জো' আসে তখন করা সবচেয়ে ভালো। রোপণের পরপরই চারার দু'পাশে দু'টি কাঠি পুঁতে বাংলার চার এর মত করে চারাটি মাঝখানে রেখে দু'টি কাঠি বেঁধে দিতে হবে। চারার নিরাপত্তার জন্য বেড়া দিতে হবে।

পরিচর্যা

রোপণের পর ৪-৫ বছর পর্যন্ত নারিকেল গাছের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা যথাসময়ে করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে গাছ দ্রুত বেড়ে ফলবান হবে এবং পরবর্তী সময়েও গাছের ওপর এর শুভ প্রতিক্রিয়া থাকবে।

সেচ ও পানি নিকাশ এবং অন্যান্য পরিচর্যা ঃ প্রথম অবস্থায় গর্তের চারদিকে মাটি এসে চারার গোড়া যেন ঢেকে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এরূপ হলে অতিরিক্ত মাটি চারার গোড়া থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। চারা যতই বড় হতে থাকবে গর্তের মাটিও আস্তে আস্তে ভরাট হতে থাকবে। শুকনো মৌসুমে নিয়মিত সেচ দিতে হবে এবং বর্ষা মৌসুমে নারিকেল বাগানের জলাবদ্ধতা না হয় এজন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কোনো গাছের ছায়া যাতে ক্ষতি না করে সেদিকে খেয়াল করতে হবে। নারিকেল গাছের জন্য উন্মুক্ত আলো-বাতাস চাই।

সারের উপরি প্রয়োগ ঃ উল্লিখিত সারের অর্ধেক পরিমাণ চারা রোপণের পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ফল আসা পর্যন্ত প্রতি বছর দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়া থেকে ৩০ সে. মি. দূরে এবং ক্রমান্বয়ে আরও দূরে গাছের বৃদ্ধি পরিমাপ করে উক্ত জায়গায় সার ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশাতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। বর্ষা শুরুর আগে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম কিস্তি সার প্রয়োগ করতে হয়। তখন বাগানের পুরো জমি চাষ করে দেয়া গাছের জন্য উপকারী। একইভাবে বর্ষা শেষে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে সার ও সেচ প্রয়োগ করতে হবে এবং জমি চাষ করতে হবে। গাছ ফল দেয়া শুরু করার পর থেকে উলি-খিত সারের সবটুকু প্রতি বছর দুই কিস্তিতে একই ভাবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং ভাদ্র-আশ্বিনে প্রয়োগ করতে হবে।

দু'টি পোকা নারিকেল গাছের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এদের একটি Rhinoceros beetle বা গোবরে পোকা এবং অপরটি 'রেড পাম উইভিল'।

পোকা দমন ঃ দু'টি পোকা নারিকেল গাছের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এদের একটি Rhinoceros beetle বা গোবরে পোকা এবং অপরটি 'রেড পাম উইভিল'। গোবরে পোকা প্রায় ৩.৫ সে. মি. লম্বা এবং ২.৫ সে. মি. চওড়া হয়। সাধারণত গোবরের সাদা, আবর্জনা ইত্যাদিতে এ পোকা জন্মায়। পূর্ণ বয়স্ক পোকা বর্ধনশীল কচি অগ্রভাগে ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে এবং কচি অংশের রস চুষে খায়। ফলে সেখানে পচন ধরে এবং বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। পঁচা অংশগুলোর আকর্ষণে 'রেড পাম উইভিল' এর আগমন হয়। এর শুককীট গাছের অগ্রভাগ কেটে ফেলে এবং গাছের মৃত্যু ঘটায়। এদু'টি পোকার আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষার করা জন্য নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(১) নারিকেল বাগানের মধ্যে বা আশে পাশে গোবর ও আবর্জনার গাদা রাখা যাবে না।

(২) যে সকল গাছ মারা গেছে বা মরার উপক্রম হয়েছে সেগুলো কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং আক্রান্ত অংশগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

(৩) বছরে অন্তত দু'বার বর্ষা শুরুর আগে এবং বর্ষা শেষে গাছের অগ্রভাগের আবর্জনা, শুষ্ক পাতা ও ছড়ার অংশ পরিস্কার করে দিতে হবে। ছিদ্র দেখতে পেলে লোহা শিক ঢুকিয়ে পোকা গেঁথে ফেলতে হবে। তাছাড়া ছিদ্র পথ দিয়ে যতটুকু সম্ভব প-াষ্টিকের সিরিঞ্জের সাহায্যে 'নগস' বা ডেনকাভ্যাপন ১০০ ইসি ঢুকিয়ে ছিদ্র কাদা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। কীটনাশক থেকে উৎপন্ন বিষ বাষ্প নারিকেল গাছের অভ্যন্তরে উইভিলের কীড়া ধ্বংস করবে।

নারিকেলের শীর্ষ পঁচা রোগ আক্রান্ত গাছের মাথা কেটে পুড়ে ফেলা উচিত

রোগ দমন ঃ শীর্ষ পঁচা (Bud rot) রোগ খুবই মারাত্তক। এ রোগে আক্রান্ত গাছের শীর্ষদেশের কোমল অংশ পঁচে বিশ্রী গন্ধ বের হয়। আক্রমনের প্রথম অবস্থায় বোরদো মিকচার ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা যেতে পরে। অথবা আক্রান্ত গাছের মাথা কেটে পুড়ে ফেলা উচিত এবং নিকটবর্তী গাছগুলোতে বোরদো মিকচার ছিটানো উচিত।

ফল আহরণ

ফুল ফোটার ১২ মাস পর নারিকেল আহরণের উপযুক্ত হয়। পরিপক্ক নারিকেলকে ঝুনা নারিকেল বলে। এদেশে গাছে উঠে বাদা কেটে রশি দিয়ে নিচে নেমে দেয়া হয়। থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়াতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বানরের সাহায্যে নারিকেল আহরণ করা হয়। ডাব হিসেবে ৬-৭ মাস বয়সের 'বাদা' একই রকম ভাবে কেটে নামানো হয়।

ফলন

এ দেশে গাছপ্রতি বছরে গড়ে ২৫/২৬ টি মাত্র নারিকেল পাওয়া যায়। কারণ সঠিক পরিচর্যার অভাব। অথচ অনেক গাছ আছে বিশেষ করে যেগুলো কুয়া বা টিউবওয়েলের পাশে সেগুলোতে বছরে ১০০-১৫০ টি নারিকেল পাওয়া যায়।

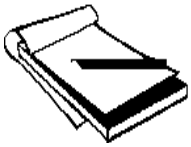

***অনুশীলন (Activity) ঃ** নারিকেলের বীজমাতা নির্বাচনের জন্য কী কী বিষয় বিবেচনায় নেয়া উচিত?*

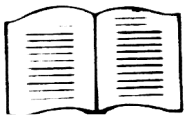

সারমর্মঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উষ্ণমন্ডলীয় দেশসমূহ ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর কোনো এক জায়গায় নারিকেলের আদি উৎপত্তিস্থল। এফসল উভয় গোলার্ধের ২৭° অক্ষাংশ পর্যন্ জন্মে। এর সুষম বৃদ্ধির জন্য দিনরাত্রির তাপমাত্রার তারতম্য ৬-৭° সেলসিয়াস সহ ২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। দীর্ঘ জলাবদ্ধতা নারিকেল গাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নয়। নারিকেলের জাতগুলোকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় যথা- (১) টিপিকা জাত (লম্বা শ্রেণি) (২) জাভানিকা জাত (মাঝারী লম্বা শ্রেণি) এবং বামন বা নানা জাত (খাটো শ্রেণি)। নারিকেলের বংশ বিস্তারের জন্য উৎকৃষ্ট গুণাবলীসম্পন্ন মাতৃগাছ নির্বাচন করা উচিত। নারিকেলের উন্নতমানের চারা উৎপাদন করে বাগানে রোপণ করতে হয়। রোপণের পর ৪-৫ বছর পর্যন্ নারিকেল গাছের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা খুবই গুর€ত্বপ র্ণ। বাগানে কোনো চারা মারা গেলে অবশ্যই পুনঃরোপণ করতে হবে। পোকামাকড় ও রোগ যথাযথভাবে দমন করা উচিত। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় গাছ প্রতি ১০০-১৫০ টি নারিকেল পাওয়া যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৬

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) নারিকেলের ইতিহাস মনে হয় মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়।

খ) প্রতিটি পুষ্পমঞ্জরীর শাখাগুলোর গোড়ার দিকে এক বা একাধিক স্ত্রীফুল এবং অগ্রভাগে অনেক পুরুষফুল থাকে।

গ) এক সারি থেকে অন্য সারিতে বীজনারিকেল রোপণের সময় মুখগুলো একই দিকে বসাতে হবে। বীজনারিকেলের যে দিকটা বেশি প্রশস্ত সেদিক মাটির সাথে লাগানো থাকবে না।

ঘ) অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় যখন মাটি কর্দমাক্ত থাকে তখন সার মিশানো বা চারা রোপণ না করে যখন মাটিতে 'জো' আসে তখন করা সবচেয়ে ভালো।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) নারিকেল এর স্ত্রীফুল পুরুষফুল অপেক্ষা ..... হয় এবং স্ত্রী ফুলগুলোকে ..... বলা হয়।

খ) নারিকেল গাছের শীর্ষে মুকুট আকারে সাজানো পল্লবকে ..... বলে।

গ) ঝুনা নারিকেলের শাঁস শুকালে তাকে..... বলে।

ঘ) আন্ত ঃফসল চাষের সুবিধার জন্য নারিকেলের চারা ..... রোপণ করা ভালো।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) রোপণের কত বৎসর পর বামন জাতের নারিকেল গাছে ফুল আসে?

ক) ২-৩ বৎসর
খ) ৩-৪ বৎসর
গ) ৪-৫ বৎসর
ঘ) ৫-৬ বৎসর

ii) টিপিকা জাতের নারিকেল গাছ হেক্টর প্রতি কতটি লাগানো উচিত?

ক) ১২২ টি
খ) ১৩৮ টি
গ) ১৩০ টি
ঘ) ১৪৬ টি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৭

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। আমের পুষ্টিমান, ব্যবহার ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ লিখুন।
২। আমের জাতসমূহের বর্ণনা দিন।
৩। লিচুর উৎপত্তি, পুষ্টিমান, ব্যবহার ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ লিখুন।
৪। লিচুর জাতসমূহের নাম লিখুন।
৫। কাঠালের উৎপত্তিস্থল, উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ লিখুন।
৬। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ করা হয়। এমন সব লেবু জাতীয় ফলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লিখুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৭

পাঠ ৭.১

১। ক) সত্য খ) সত্য গ) সত্য ঘ) মিথ্যা

২। ক) এ ঘ) স্ত্রীফুল পুরুষফুল উভলিঙ্গ ফুল গ) মহানন্দা

৩। i) খ ii) গ iii) ক

পাঠ ৭.২

১। ক) সত্য খ) সত্য গ) মিথ্যা ঘ) সত্য

২। ক) এরিল খ) পরাগায়ন গ) জ্যৈষ্ঠ ঘ) ৫৫-৬০

৩। i) ক ii) গ

পাঠ ৭.৩

১। ক) সত্য খ) সত্য গ) মিথ্যা ঘ) মিথ্যা ঙ) সত্য

২। ক) সরোসিস খ) ৯০ ১১০ গ) নিষেক ঘ) দুটি ডেগা

৩। i) গ ii) খ

পাঠ ৭.৪

১। ক) মিথ্যা খ) মিথ্যা গ) সত্য ঘ) সত্য ঙ) সত্য

২। ক) শুঙ্গ খ) কাজী গ) ২০ ২২

৩। i) খ ii) খ

পাঠ ৭.৫

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) মিথ্যা ঘ) সত্য ঙ) সত্য

২। ক) লেবু জামির খ) সি গ) বেরী ঘ) Mandarin

৩। i) খ ii) খ

পাঠ ৭.৬

১। ক) মিথ্যা খ) সত্য গ) মিথ্যা ঘ) সত্য

২। ক) বড় Button খ) ক্যাবেজ গ) কোপরা ঘ) বর্গাকারে

৩. i) খ ii) খ

তথ্যসূত্র

এম,এফ মন্ডল ও এম, রায়, ১৯৮৮। আধুনিক ফল বিজ্ঞান।

Ahmad, K.U.1976. Flowers, Fruits and Vegetables (3rd edition, in bengali) Alhaj Kamisuddin Ahmad, Bunglalow No. 2, Farm Gate, Dhaka-15. 610 p.

DAE,. 1995. Training Manual on Plant Propagation and Nursing Management, Dhaka.

Gardner, V. R., F. C. Bradford and H. D. Hooker, 1952. The Fundamentals of Fruit Production. McGraw-Hill Book Co. Inc., New york. 739 p.

Gourley, J.H. and F.S. Howlett, 1960. Modern Fruit Production. Macmillan Co., New York. 579 p.

Hartmann and kester, 1982. Plant Propagation, Principles and Practices.

Islam, M. A, 1967. Soil Fertility Investigation in East Pakistan. Agricultural Information Service. 3, R.K. Mission Rood, Dacca. p 72.

Janick. J, 1972. Horticultural Science (2nd edition). W.H. Freeman and Co., San Francisco, U.S.A. 586 p.

J Janick, 1982. Horticultural science. 3rd ed.

Jana, B. K. and A. Ghosh, 1991. Adhunik Paddhatita Fole Chas (in bengali). Day's Publishing, Calcutta 700073, India. 318 p.

Karim, Z., M. I. Ali, M.M.U. Mia and S.K. G. Hussain, 1989. Title BARC, Farm Gate, New Air port Road, Dhaka 1215.

Maniruzzaman, F. M, 1988. Bangladesher Faler Chash (in bengali). Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. 381 p.

Mondal, M. F. and M. Roy, 1988. Adhunik Phal Biggan (in bengali) Mrs. Afia Mondal, BAU Campus, Mymensingh. 335 p.

Mandal, M F. and M.R. Amin, 1990. Faler Began (Fruit Garden). BAU, Mymensingh.

Naik, K. C, 1963. South Indian Fruit and Their Culture. P. Varadachary and Co. 8, Linghi chetty St. Madras, India. 335 p.

Nazimuddin, M. and A.K.M. A. Hossain, 1988. Effect of different types of planting materials on the growth and yield of pineapple cv. Giant Kew. Bangladesh Hort, 16 (2): 30-34

Rashid, M.A., M.A. mannan and A.K.M. A Hossain, 1992. Effect of irrigation on banana production. Bangladesh Hort, 20 (2): 75-79.

Singh, L.B., 1960. The Mango: Botany, Cultivation and Utilization. Leonard Hill, London.

Singh, S.,S. Krishnamurthi and S.L Katyal (Compiled), 1963. Fruit Culture in India. ICAR, New Delhi.

Singh, R.N., 1978. Mango. ICAR, New Delhi.

Singh, A., 1980. Fruit Plysiolosy and Production (Third edition). Kalyani Publishers, New Delli, India. 565 p.

Saha, S.K. and A.K.M. A. Hossain, 1992. Fruit characteristics of five litchi varieties. Bangladesh Agri. Res, 17 (1): 77-82.

Saha, S.K., A.Ahmed and A.K.M. A. Hossain, 1992. Growth and yield of papaya as affected by NPK fertilizers. Bangladesh Hort, 20 (1): 73-79.

Saha, M.G., S.K. Saha, A.K. Azad and A.K.M.A. Hossain, 1993. Yeild and quality of pineapple as afected by removal of crowns, slips and side suckers. Thai J. Agric. Sci, 28:15-20.

Uddin, M.N. and A.K.M.A. Hossain, 1993. Study on the storage of pineapple. Bangladesh Hort, 21(2): 7-12.

Valmayor, R.V. and R.C. Espino, 1976. Banana Production in the Philippines. Extension CCircular No. 8. Department of Horticulture, UPLB, Philipaines.